বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

তিতানি এবং তিতুনি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

তিতুনি চেয়ারটাতে বসল, দেখে বোঝা যায় না কিন্তু চেয়ারটাতে বসতে খুব আরাম। আশেপাশে চারিদিকে নানারকম যন্ত্রপাতি। শামীম উপর থেকে টেনে একটা হেলমেট নিচে নামিয়ে এনে তার মাথার মাঝে পরিয়ে দিল, সাথে বাইরের নানা ধরনের শব্দ কমে গিয়ে শুধু শোঁ শোঁ একটা শব্দ শুনতে পায়। চেয়ারের হাতলে তিতুনির দুটো হাত রাখা ছিল, দুটো যন্ত্র এসে হাত দুটোকে হাতলের সাথে আটকে ফেলল। তিতুনি টের পেল তার পা দুটোকেও একই কায়দায় আটকে দেয়া হয়েছে। বুকের উপর দুই পাশ থেকে দুটো চতুষ্কোণ যন্ত্র এসে আড়াআড়িভাবে তাকে আটকে ফেলেছে। তিতুনির বুকটা ধুকপুক করতে থাকে। এখান থেকে সে ছুটে বের হতে পারবে তো?

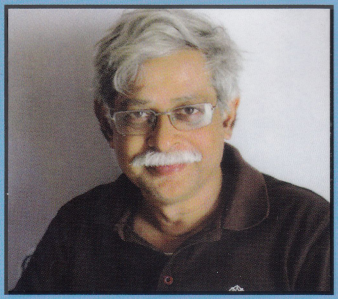

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট।

বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাস্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহ্‌জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্ত্রী প্রফেসর ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

পাঠকনন্দিত এই লেখক ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

আলোকচিত্র : তাসনোভা আবিদা সেঁজুতি

তিতলি
এবং
তিতলি

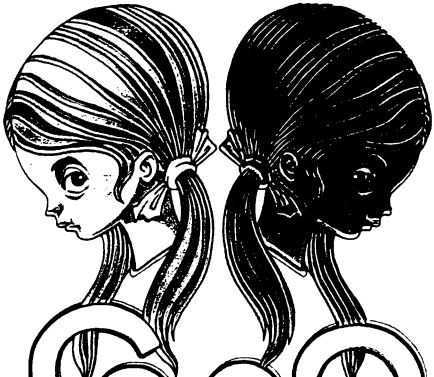

তিতলি এবং তিতলি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

কাকলী প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

স্বত্ব
প্রফেসর ড. ইয়াসমীন হক

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
সাদাতউদ্দীন আহ্‌মেদ এমিল

বর্ণ বিন্যাস
আলিফ-মীম কম্পিউটার্স
বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

দাম : ৩০০ টাকা

Tituni Ebong Tituni, by Muhammed Zafar Iqbal
Published by A. K. Nasir Ahmed Salim
Kakoli Prokashoni, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
Price : Tk. 300 Tk. Only

ISBN : 978-984-91844-1-6

উৎসর্গ

মেহেদী হাসান খান
আমার মা যাকে জন্ম দেননি।
তারপরও যে আমাদের থেকেও
তাঁর বেশি খাঁটি একজন সন্তান।

কাকলী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

শাহনাজ ও ক্যাপ্টেন ডাবলু
আমার বন্ধু রাশেদ
বুবুনের বাবা
আধুনিক ঈশপের গল্প
দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর
দেশের বাইরে দেশ
দুঃস্বপ্নের রাত এবং দুর্ভাবনার দিন
রবোনগরী
একটুখানি বিজ্ঞান
আরো একটুখানি বিজ্ঞান

১

তিতুনির খুব মন খারাপ। তিতুনির যখন মন খারাপ হয় তখন সে তাদের বাসার ছাদে উঠে রেলিংয়ের উপর মুখ রেখে গালে হাত দিয়ে দূরে তাকিয়ে থাকে। তাদের বাসার পিছনে অনেক বড় বড় গাছ, সেই গাছের ফাঁক দিয়ে তাকালে দূরে ধান ক্ষেত চোখে পড়ে। আরো দূরে তাকালে কিন্নরী নদীটার পানিকে চিকচিক করতে দেখা যায়। একটু উপরে তাকালে দেখা যায় নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘ। আরো ভালো করে তাকালে দেখা যায় মেঘের ভেতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বের হয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

দূরে তাকিয়ে থেকে তিতুনী বাতাসে গাছের পাতার শব্দ শুনে, তখন খুব ধীরে ধীরে তার মনটা একটু শান্ত হয়। মনটা শান্ত হলেও তার ছোট বুকটা ভার হয়ে থাকে, মনে হয় সে সবকিছু ছেড়েছুড়ে একদিন দূরে কোথাও চলে যাবে। সেখানে আব্বু আর আম্মু তাকে খুঁজে পাবে না, তার ভাই টোটনও তাকে আর জ্বালাতন করতে পারবে না।

তিতুনির বয়স বারো, তার বড় ভাই টোটনের বয়স চৌদ্দ। তিতুনির মনে হয় টোটনের জন্মের পর নিশ্চয়ই তার মুখে কেউ মধু দেয়নি, কিংবা কে জানে হয়তো মধু মনে করে ভিনেগার ঢেলে দিয়েছিল। তাই টোটন সব সময় চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা বলে। তিতুনির সাথে কথা বলার সময় শুধু যে চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা বলে তা নয়, একটানা তিতুনিকে টিটকারি করতে থাকে। কোনো কারণ থাকুক আর না-ই থাকুক সারাক্ষণ তিতুনিকে বকাবকি করতে থাকে। কিছু একটা হলেই আব্বু-আম্মুর কাছে নালিশ করে দেয়। সব সময়

একটা ছুতো খুঁজতে থাকে কীভাবে তিতুনিকে বিপদে ফেলবে। আব্বু আর আম্মু মনে হয় বিষয়গুলো দেখেও দেখেন না, টোটন তাদের বড় ছেলে বলে তার জন্যে তাদের আদর অনেক বেশি। কিছু একটা হলেই তারা সব সময় টোটনের পক্ষে কথা বলতে থাকেন।

যেমন আজ সকালের কথাটাই ধরা যাক। নাশতার টেবিলে বসে তিতুনি আর টোটন আব্বু আর আম্মুর সাথে বসে নাশতা করছে। নাশতা শেষ করে তিতুনি যখন হাত বাড়িয়ে পানির গ্লাসটা নেবে ঠিক তখন টোটন দিল তাকে একটা ধাক্কা সেই ধাক্কায় হাতে লেগে গ্লাসটা উল্টে পড়ে সারা টেবিলে পানি থই থই করতে লাগল। গ্লাসটাও গড়িয়ে টেবিল থেকে পড়ে যাচ্ছিল, তিতুনি খপ করে গ্লাসটাকে ধরে ফেলতে চেষ্টা করল, গ্লাসটা তখন কেমন জানি হাত থেকে পিছলে বের হয়ে মেঝেতে পড়ে একশ' টুকরো হয়ে গেল। ভাঙা কাচের টুকরো ছড়িয়ে গেল সারা ঘরে।

আব্বু একটা ছোট চিৎকার করলেন, আম্মু অনেকটা আর্তনাদের মতো শব্দ করলেন আর টোটন এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে মনে হলো যে তিতুনি বুঝি ভুল করে ঘরের মাঝে একটা এটম বোমা ছুড়ে দিয়েছে।

আম্মু বললে, "কী করলি এটা?"

তিতুনি বলল, "হাতে লেগে পড়ে গেল।"

আম্মু বললেন, "হাতে লেগে পড়ে গেল মানে? নিজের হাতের উপর কন্ট্রোল নাই?"

তিতুনি তখন আসল ঘটনাটা বলার চেষ্টা করল, "পানির গ্লাসটা ধরার চেষ্টা করছিলাম ঠিক তখন ভাইয়া–"

আম্মু ভুরু কুঁচকে বললেন, "ভাইয়া?"

"ভাইয়া একটা ধাক্কা দিল।"

টোটন তখন প্রায় লাফিয়ে উঠে হাত-পা নেড়ে গলা উঁচিয়ে বলল, "আমি? আমি ধাক্কা দিয়েছি? আম্মু দেখেছ কত বড় মিথ্যুক। নিজে গ্লাসটা ভেঙে এখন আমাকে দোষ দেয়। কত বড় মিথ্যুক! কত বড় পাজি দেখেছ আম্মু? তোমরা এই পাজিটাকে কিছু বলো না দেখেই এত সাহস হয়েছে। শুধু মিথ্যা কথা বলে।"

আম্মু বললেন, "ছিঃ তিতুনি। ছিঃ!"

আব্বু বললেন, "মিথ্যা কথা বলে না তিতুনি।"

তিতুনি বলল, "আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। ভাইয়া ইচ্ছা করে আমাকে ধাক্কা দিয়েছে।"

টোটন তখন আরো জোরে চিৎকার করে বলল, "দেখেছ আম্মু-আব্বু? কত বড় পাজি দেখেছ? কত বড় শয়তান দেখেছ? নিজে জবুথবু–হাত-পায়ের উপর কন্ট্রোল নাই। এত বড় দামড়া হয়েছে এখনো কিছু করতে পারে না। এক গ্লাস পানি খেতে গিয়ে টেবিলটা পানি দিয়ে ভাসায়। গ্লাসটা ভেঙে ফেলে–এই তিতুনিরে তোমরা যদি কন্ট্রোল না করো পুরো বাসার সবকিছু ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিবে। এই মিথ্যুককে, পাজি, বদমাইশ মেয়েটাকে তোমরা কিছু বলো না কেন?"

টোটনের কথায় তিতুনের চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। কোনোমতে চোখের পানি আটকে রেখে ভাঙা গলায় বলল, "আমি মিথ্যুক না। তুমি মিথ্যুক।"

টোটন এবারে রাগে ফেটে পড়ল, তিতুনিকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "চুপ কর বদমাইশ মেয়ে। কত বড় পাজি। এক্ষুনি চুপ কর।"

তিতুনি বলল, "তুমি চুপ করো।"

টোটন তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে তিতুনিকে আরেকটা ধাক্কা দিল। আব্বু বললেন, "অনেক হয়েছে। এখন থামো।"

আম্মু বললেন, "তিতুনি! এসব কী হচ্ছে?"

তিতুনির চোখে পানি এসে গেল। বলল, "আমি কী করেছি? ভাইয়াই তো আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে–"

টোটন বলল, "মোটেই ধাক্কা দেই নাই। খালি একটু ছুঁয়েছি। তুই এত পাজি, তোকে পিটিয়ে লম্বা করে দেয়া উচিত। বড় ভাইয়ের সাথে মিথ্যা কথা বলিস! মিথ্যুক।"

আব্বু বললেন, "তিতুনি, তুমি কেন টোটনকে জ্বালাচ্ছ?"

আম্মু বললেন, "ছিঃ! তিতুনি ছিঃ। সবার সামনে বসে এ রকম মিথ্যে কথা বলছ? এত বড় হয়েছ, এখনো এক গ্লাস পানি হাত দিয়ে

ঠিক করে ধরতে পারো না? সকালবেলা একটা গ্লাস ভেঙে ফেললে! আমার সেটের গ্লাস। আবার টোটনের দোষ দিচ্ছ?"

টোটন বলল, "পাজি মেয়ে। মিথ্যুক মেয়ে।"

আব্বু বললেন, "ব্যস অনেক হয়েছে।"

আম্মু বললেন, "যাও ঝাড়ু নিয়ে এসে ভাঙা কাচ পরিষ্কার করো। শাস্তি না দিলে তুমি শিখবে না।"

টোটন বলল, "যা। ঝাড়ু আন। ঝাড়ুদারনী।"

তিতুনি ঝাড়ু দিয়ে ভাঙা কাচ পরিষ্কার করল। টেবিল মুছে দিল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে ছাদের রেলিংয়ে মুখ রেখে দূরে তাকিয়ে রইল। দূরে তাকিয়ে তাকিয়ে তিতুনি কল্পনা করে যে একদিন সে যখন বড় হয়ে অনেক বড় বিজ্ঞানী হবে, যখন তার অনেক টাকা-পয়সা হবে, তখন সে দুই ট্রাক বোঝাই করে কাচের গ্লাস নিয়ে আসবে–আজকে যে গ্লাসটা ভেঙেছে ঠিক সে রকম গ্লাস। তারপর বাসায় যখন কেউ থাকবে না তখন সেই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কাচের গ্লাস দিয়ে বাসাটা বোঝাই করে দেবে। আম্মু আর আব্বু যখন বাসায় এসে দরজা খুলে বাসায় ঢুকতে যাবে তখন অবাক হয়ে দেখবে বাসাভর্তি শুধু গ্লাস আর গ্লাস–ভেতরে ঢোকারও জায়গা নেই। আম্মু অবাক হয়ে বলবে, "এখানে এত গ্লাস কোথা থেকে এলো?"

তখন তিতুনি আড়াল থেকে বের হয়ে বলবে, "আমি এনেছি।"

আম্মু আর আব্বু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, "কেন? তিতুনি, কেন তুমি এতগুলো গ্লাস এনেছ?"

তখন তিতুনি বলবে, "মনে আছে, আজ থেকে বিশ বছর আগে একদিন আমার হাত থেকে পড়ে একটা গ্লাস ভেঙে গিয়েছিল? সেদিন তোমরা আমাকে কত বকাবকি করেছিলে মনে আছে? আমাকে দিয়ে সেই ভাঙা কাচ পরিষ্কার করিয়েছিলে মনে আছে?"

আম্মু বলবে, "না তিতুনি, আমার মনে নাই।"

আব্বুও বলবে, "কই? আমার তো মনে পড়ছে না!"

তখন তিতুনি বলবে, "তোমাদের মনে না থাকতে পারে আম্মু আর আব্বু, কিন্তু আমি সেটা ভুলি নাই। আমি কখনো ভুলব না। বিশ বছর

আগে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি কখনো আমার ক্ষমতা হয় তাহলে আমি তোমাদের বাসা ভর্তি করে গ্লাস দিয়ে যাব। গ্লাস আর গ্লাস আর গ্লাস। আমার ক্ষমতা হয়েছে, তাই তোমাদের বাসা ভর্তি করে গ্লাস দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা এই গ্লাস নিয়ে সুখে থেকো। আমি গেলাম।"

আম্মু তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলবে, "কোথায় গেলি?"

"আমি চলে যাচ্ছি অনেক দূরে। তোমরা আমাকে আর পাবে না।"

তখন আম্মু আরো জোরে কাঁদতে কাঁদতে বলবে, "আমরা তাহলে কাকে নিয়ে থাকব?"

তিতুনি তখন মুখ শক্ত করে বলবে, "তোমরা আমাকে কখনো ভালোবাস নাই। আদর করো নাই। তোমাদের কাছে আমার থেকে বেশি আদরের জিনিস হচ্ছে এই গ্লাস। তোমরা এই গ্লাস নিয়ে থাকো।"

আব্বু বলবে, "কিন্তু একজন মানুষ তার সন্তান ছাড়া শুধু গ্লাস নিয়ে কেমন করে থাকবে মা তিতুনি?"

তখন তিতুনি বলব, "কেন আব্বু? তোমাদের সন্তান টোটন তো আছে। তোমরা তাকেই যখন বেশি ভালোবাস তাকে নিয়েই থাকো।"

তখন আম্মু হাউমাউ করে কেঁদে বলবে, "কিন্তু টোটন তো বড় সন্ত্রাসী। টোটন তো ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। পাবলিক গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে দিয়েছে। পুলিশ আট দিনের রিমান্ডে নিয়েছে। সে তো মানুষ নামের কলঙ্ক।"

তিতুনি তখন হা হা করে হেসে উঠে বলবে, "আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি যখন ছোট একটা মেয়ে ছিলাম, যখন তোমাদের ছেলে টোটন আমার উপরে সন্ত্রাসী হয়ে অত্যাচার করেছে, তখন তোমরা তো একবারও আমার পাশে দাঁড়াও নাই। সন্ত্রাসী টোটনের অত্যাচার থেকে আমাকে রক্ষা করো নাই। তখন যদি তাকে শাসন করতে তাহলে আজ সে এত বড় সন্ত্রাসী হতো না। দেশের মানুষ তাকে চান্দি ছোলা টোটন বলত না।"

আম্মু তখন বলত, "আমার ভুল হয়েছে। ভুল হয়েছে মা তিতুনি। তুই আমাদের ক্ষমা করে দে।"

তিতুনি যখন এই দৃশ্যটা কল্পনা করছে ঠিক তখন হঠাৎ বিকট শব্দ করে গাছের ডাল-পাতা ভেঙে কিছু একটা প্রচণ্ড বেগে মাটিতে আঘাত করল। সমস্ত বাসা থরথর করে কেঁপে উঠল, ঝনঝন শব্দ করে অনেকগুলা কাচের জানালা ভেঙে গেল। গাছে বসে থাকা অনেকগুলো পাখি কিচিরমিচির করতে করতে উড়ে গেল। বাসার ভেতর থেকে আব্বু-আম্মু আর টোটন চিৎকার করে উঠল। তিতুনি শুনল দরজা খুলে সবাই বাসা থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, টোটন "ভূমিকম্প ভূমিকম্প" করে চিৎকার করছে।

পুরো ব্যাপারটা বুঝতে তিতুনির কয়েক সেকেন্ড লাগল, যখন বুঝতে পারল তখন ছাদের অন্য পাশে গিয়ে তিতুনি নিচের দিকে তাকায়। বাসার সামনে খোলা জায়গাটাতে আব্বু-আম্মু আর টোটন দাঁড়িয়ে আছে। তিতুনি দেখল, আম্মু পাগলের মতো তার নাম ধরে ডাকছেন।

তিতুনি ছাদ থেকে বলল, "আম্মু, আমি এখানে।"

টোটন বলল, "তাড়াতাড়ি নাম গাধা কোথাকার।"

তিতুনি বলল "কেন?"

টোটন বলল, "গাধা, তুই জানিস না ভূমিকম্প হলে বাসার বাইরে থাকতে হয়?"

তিতুনি বলল, "এটা ভূমিকম্প না।"

টোটন বলল, "এটা ভূমিকম্প না মানে? দেখছিস না কীভাবে বাসা কাঁপছে! মাথার মাঝে গোবর?"

তিতুনি বলতে যাচ্ছিল সে দেখেছে আকাশ থেকে প্রচণ্ড বেগে কিছু একটা তাদের বাসার পিছনে পড়েছে, কিন্তু মাথার মাঝে গোবর শুনে তিতুনির মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সে বলল, "আমার মাথার মাঝে যদি গোবর থাকে, তাহলে তোমার মাথার মাঝে মানুষের ইয়ে–"

টোটন বলল, "কী বললি? কী বললি তুই?"

"বলেছি, তোমার মাথার মাঝে মানুষের ইয়ে–মানে বাথরুম।"

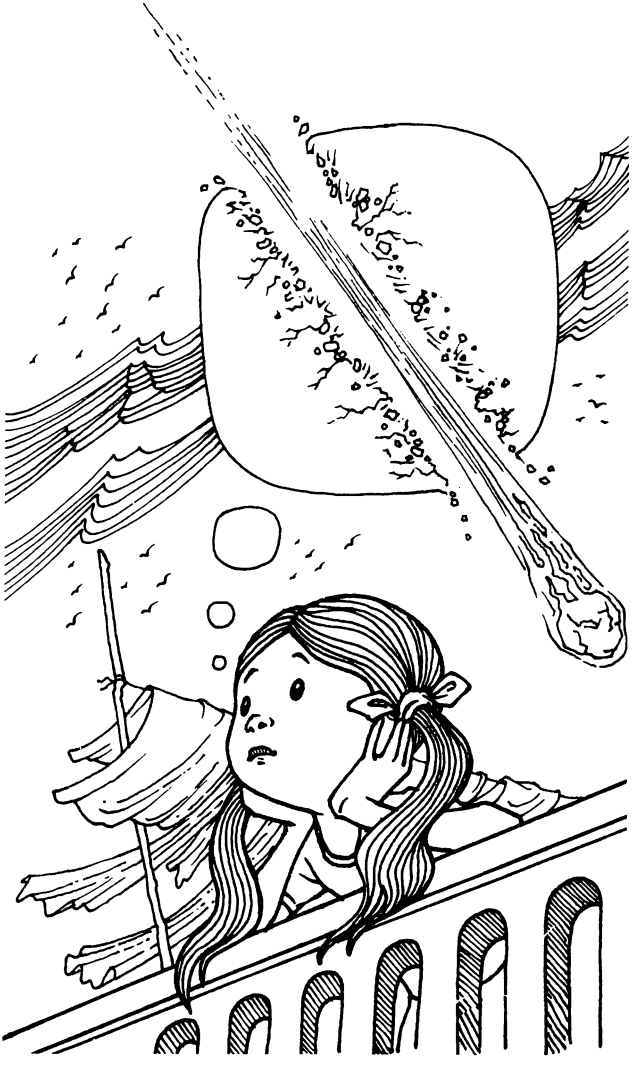

টোটন হুংকার দিয়ে বলল, "আম্মু দেখেছ, দেখেছ তিতুনি কী বলছে?"

কিন্তু আম্মু আর আব্বুর তখন কার মাথার মাঝে গোবর আর কার মাথার মাঝে মানুষের ইয়ে সেটা শোনার আগ্রহ নাই। তারা এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। অন্যান্য বাসা থেকেও মানুষজন বের হয়ে এসেছে, আব্বু আর আম্মু তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সবাই পুরো ব্যাপারটাকে একটা ভূমিকম্প বলেই ধরে নিয়েছে। শুধু তিতুনি জানে এটা ভূমিকম্প না, আকাশ থেকে কিছু একটা প্রচণ্ড বেগে তাদের বাসার পিছনে গাছগুলোর ভেতর দিয়ে মাটিতে পড়েছে। এটা নিশ্চয়ই একটা উল্কা। কেউ এই উল্কাটার কথা জানে না, শুধু তিতুনি জানে। অন্য যেকোনোদিন হলে সে এটা সবাইকে বলে দিত, তারপর সবাই মিলে বাসার পিছনে গিয়ে মাটিতে গেঁথে যাওয়া সেই উল্কাটা খুঁজে বের করত।

কিন্তু আজকে সবাই মিলে তিতুনির সাথে যে রকম ব্যবহার করেছে তার কারণে সে কাউকে কিছু বলল না। যখন কেউ থাকবে না তখন সে একা গিয়ে দেখবে উল্কাটা কোথায় পড়েছে। যদি পারে সে উল্কাটাকে বের করবে। উল্কা কত বড় হয় কে জানে। দেখতে কেমন হয় সেটাই বা কে জানে।

তিতুনি নিজের ভেতরে একটা উত্তেজনা অনুভব করে।

একটু আগে তার খুব মন খারাপ ছিল, এখন আর মন খারাপ নাই। মন খারাপের বদলে এখন তার ভেতরে উত্তেজনা আর কৌতূহল।

তিতুনি বাসার ছাদ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো।

২

বাসার সবাই যখন নিজেরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত তখন তিতুনি বাসা থেকে বের হয়ে এলো। তারা যেখানে থাকে সেটা একটা গ্রামও না আবার শহরও না। তিতুনি অবশ্য শহর খুব বেশি দেখে নাই, তাই শহর কী রকম হয় ভালো করে জানে না। শহর বলতে সে শুধু ঢাকা শহরকে দেখেছে–মানুষের ভিড়, একটার পাশে আরেকটা ঘিঞ্জি বিল্ডিং একবার দেখেই তার শহর দেখার শখ মিটে গেছে। তিতুনিদের বাসাটা ফাঁকা একটা জায়গায়, বাসার পিছনে বড় বড় গাছ, বলা যায় রীতিমতো জঙ্গল। এই জঙ্গলে বাঘ-ভালুক নাই কিন্তু অনেক পাখি আছে। গাছে কাঠবিড়ালী আছে। হঠাৎ হঠাৎ একটা ফাজিল টাইপের বানর আসে। রাত্রে মাঝে মাঝে শেয়াল ডাকে। সে যখন স্কুলে যায় তখন উঁচু একটা সড়ক ধরে হেঁটে যায়। সড়কটার দুই পাশে বড় বড় গাছ। স্কুলে বিশাল মাঠ, পিছনে বিরাট দিঘি। তিতুনি বড় হয়েছে খোলা জায়গায় গাছপালার ভেতরে। সে গাছে উঠতে পারে, সাঁতার কাটতে পারে, খালি পায়ে ধান ক্ষেতে দৌড়াতে পারে।

তিতুনি বাসা থেকে বের হয়ে ঘুরে বাসার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মাথা ঘুরিয়ে দেখল কেউ তাকে লক্ষ করছে কি না। যখন দেখল কেউ তাকে দেখছে না তখন সে ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে জঙ্গলের মতো জায়গাটায় ঢুকে গেল। কেউ দেখলেও অবশ্য কোনো সমস্যা নেই, সবাই জানে তিতুনি একা একা এই জায়গাটাতে অনেক সময় কাটায়। একটা গাছ থেকে সে দড়ি দিয়ে দোলনা ঝুলিয়েছে সেখানে দোল খায়। লটকনের সময় একটা লটকন গাছে বসে বসে জংলি টক লটকন খায়। বৃষ্টি হলে একটু কাদা হয়ে যায়, আগাছা

বেড়ে যায়, জোঁক বের হতে থাকে, তখন সে এখানে বেশি ঢুকে না। এখন বৃষ্টি নেই, শুকনো আবহাওয়া, নিচে শুকনো পাতা, পায়ের নিচে কুড়মুড় শব্দ করে পাতাগুলো যখন গুঁড়ো হয়ে যায়, তিতুনির তখন কেমন জানি আনন্দ হয়।

তিতুনি সাবধানে হেঁটে যেতে যেতে চারিদিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকায়। মোটামুটি কোন জায়গাটাতে উল্কা পড়েছে সে বাসার ছাদ থেকে দেখেছে। যেভাবে পুরো এলাকাটা কেঁপে উঠেছে তাতে মনে হয় জায়গাটা খুঁজে বের করতে কোনো সমস্যা হবে না।

সত্যি সত্যি তিতুনি জায়গাটা পেয়ে গেল, মাটিতে একটা গর্ত এবং সেই গর্তের চারপাশে ফাটল। পুরো মাটিটা একেবারে ঝলসে গেছে, গাছ, লতাপাতা গরমে পুড়ে গেছে, আগুন যে ধরে যায়নি সেটাই আশ্চর্য।

তিতুনি হেঁটে হেঁটে গর্তটার কাছে গেল, মনে হলো আশেপাশের মাটিটা পুড়ে একেবারে শক্ত পাথর হয়ে গেছে। ওপরে তাকিয়ে দেখল গাছের ডালপালা ভেঙে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে গেছে। তিতুনি গর্তটার কাছে গিয়ে অবাক হয়ে গেল, গর্তটার মুখের কাছে পুরো মাটিটা ঝলসে কাচের মতো হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে ছোট-বড় কাচের স্ফটিক দিয়ে কেউ একজন অনেক যত্ন করে এটা তৈরি করেছে। তিতুনি গর্তটার ভেতরে উঁকি দিল, অনেক গভীর গর্ত, বাইরে থেকে ভেতরে কিছু দেখা যায় না। একটা টর্চ লাইট নিয়ে এলে ভেতরে আলো ফেলে দেখা যেত। তিতুনি গর্তের ভেতরে হাত দিয়ে দেখে, গোল গর্তটার পুরোটা প্রচণ্ড তাপে মসৃণ কাচের মতো হয়ে গেছে। গর্তটা এখনো গরম। তিতুনি অবাক হয়ে গর্তটার ভেতরে তাকিয়ে রইল।

ঠিক তখন হঠাৎ খুব বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটল। তিতুনির মনে হলো কেউ একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। এত বাস্তব অনুভূতি যে তিতুনি মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকাল, দেখার চেষ্টা করল কেউ সত্যি সত্যি তার দিকে তাকিয়ে আছে কি না। কেউ কোথাও নেই, চারিদিকে শুধু লম্বা লম্বা গাছ, বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে। ঠিক কী কারণ জানা নেই। তিতুনির কেমন জানি একটু ভয় ভয় করতে থাকে। সকালবেলা চারিদিকে দিনের আলোতে ঝলমল করছে, এর মাঝে ভয়

পাবার কিছু নেই কিন্তু তারপরও তিতুনির কেমন জানি ভয় ভয় করে। কী নিয়ে ভয় সেটাও সে বুঝতে পারছে না, সেটাই সবচেয়ে অবাক ব্যাপার। তিতুনি কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ করে তার মনে হলো এখানে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, তার এখানে থাকা ঠিক হবে না। তার এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত কিন্তু সে নড়তে পারছিল না। তার কেন জানি মনে হতে থাকে সামনে মাটি চৌচির করে ফেটে তৈরি হওয়া গর্তটার ভেতর থেকে কিছু একটা বের হয়ে আসবে, ভয়ংকর কোনো একটা প্রাণী, যেটা এখন গর্তের ভেতরে ঘাপটি মেরে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তিতুনির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। নাকের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে।

তিতুনি নিজেকে বোঝাল পুরোটাই নিশ্চয়ই একটা কল্পনা, এখানে ভয় পাবার কিছু নেই। তারপরেও তিতুনি ঠিক করল সে এখন চলে যাবে। দরকার হলে একটু পরে বড় মানুষদের নিয়ে আসবে। কিন্তু হঠাৎ করে তার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল, মনে হলো সে বুঝি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। সে কাছাকাছি একটা গাছকে ধরে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিল। তিতুনির মনে হতে থাকে তার মাথার ভেতরে যেন হাজার হাজার মানুষ চিৎকার করে কথা বলছে, সে সবার কথা শুনছে কিন্তু কারো কথাই বুঝতে পারছে না। চোখের সামনে সবকিছু কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যায়, তার মনে হতে থাকে, সবকিছু ঘুরপাক খাচ্ছে। তিতুনি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল তখন, খুব ধীরে ধীরে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে। তিতুনি আবার চারিদিকে তাকাল। চারিদিকে সবকিছু ঠিক আগের মতোই আছে। শক্ত পুড়ে যাওয়া মাটি, গোল একটা গর্ত, সেখান থেকে চৌচির হয়ে যাওয়া মাটি, গর্তের মুখে ছোট-বড় স্বচ্ছ স্ফটিক। কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তিতুনি গর্তের ভেতর তাকিয়ে রইল, তখন হঠাৎ করে মনে হলো গর্তের ভেতর কিছু একটা যেন নড়ে উঠল। তিতুনির আতঙ্কে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, একটা চিৎকার দিয়ে সে ছুটে যেতে চাইল, কিন্তু কী আশ্চর্য–সে নড়তে পারল না। চোখ বড় বড় করে সে গর্তটার দিকে তাকিয়ে রইল। সে স্পষ্ট শুনতে পেল গর্তটার ভেতরে একটা

খচমচ শব্দ হচ্ছে, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ভেতর থেকে কিছু একটা বের হয়ে আসছে।

প্রথমে একটা হাত বের হয়ে এলো, ঠিক মানুষের হাত, দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা বড় মানুষের হাত না, কম বয়সী একটা বাচ্চার হাত। তারপর আরেকটা হাত বের হয়ে গর্তটার মুখটা ধরে নিজেকে টেনে বের করার চেষ্টা করতে থাকে। প্রথমে মাথার কালো চুল, তারপর হ্যাঁচকা টান দিয়ে বাচ্চাটা তার শরীরের অর্ধেকটা বের করে আনে। তিতুনি অবাক হয়ে দেখল ঠিক তার বয়সী একটা মেয়ে, তার দিকে পিছনে ফিরে বসেছে বলে চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটা আরেকটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্রায় পুরো শরীরটা বের করে গর্তের উপরে বসে পড়ল, পা দুটো শুধু গর্তের মাঝে ঝুলে আছে। তারপর মেয়েটা ঘুরে তিতুনির দিকে তাকাল। তিতুনির মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায়, গর্ত থেকে যে মেয়েটা বের হয়ে এসেছে সেই মেয়েটা আরেকটা তিতুনি। তিতুনির মতো দেখতে একটি মেয়ে নয়, পুরোপুরি তিতুনি। সে নিজে।

তিতুনির মনে হলো সে গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দিবে, কিন্তু সে এত অবাক হয়েছে যে মুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইল, গলা থেকে কোনো শব্দ হলো না। গর্তে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। বেশ শান্ত দৃষ্টি, তিতুনিকে দেখে সে মোটেও অবাক হচ্ছে না।

তিতুনি নিঃশ্বাস বন্ধ করে খুব সাবধানে এক পা এক পা করে পিছিয়ে যেতে থাকে। একটু পিছিয়েই সে এক দৌড়ে বাসায় চলে যাবে। বড় একটা গাছের কাছে এসে সে গাছটার আড়ালে লুকিয়ে গেল। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে সে আরো একবার উঁকি দিয়ে তাকাল। তিতুনি মনে মনে আশা করছিল যে সে দেখবে আসলে গর্তটার উপরে কেউ বসে নেই, সব তার চোখের ভুল। কিন্তু তিতুনি দেখল গর্তটার উপরে পা ঝুলিয়ে এখনো সেই তিতুনিটা বসে আছে। তার চোখে চোখ পড়তেই পা ঝুলিয়ে বসে থাকা তিতুনিটা একটু হাসার চেষ্টা করল, ঠিক তিতুনি যে রকমভাবে হাসে।

তিতুনি একটা দৌড় দিতে গিয়ে থেমে গেল, আবার মেয়েটার দিকে তাকাল, মেয়েটা এখনো শান্তভাবে বসে পা দোলাচ্ছে, মাথা তুলে গাছগুলো দেখছে। তিতুনি আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপর একটা খুব সাহসের কাজ করে ফেলল, জিজ্ঞেস করল, "এই, তুমি কে?"

তিতুনির মতো দেখতে মেয়েটা মাথা ঘুরে তাকাল, বলল, "কে? আমি?" গলার স্বর হুবহু তিতুনির মতো।

তিতুনি বলল, "হ্যাঁ। তুমি।"

মেয়েটা বলল, "কেন, আমি তিতুনি!"

ঠিক কী কারণ জানা নেই মেয়েটার কথা শুনে তিতুনির ভয়টা কেটে কেমন যেন একটু রাগ উঠে যায়। সে গলা উঁচিয়ে বলল, "না। তুমি তিতুনি না। আমি তিতুনি।"

মেয়েটা কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। একটু মাথা চুলকে বলল, "তাহলে আমি কে?"

মেয়েটাকে এ রকম ভ্যাবাচেকা খেয়ে যেতে দেখে তিতুনির সাহস আরেকটু বেড়ে গেল, গলা আরেকটু উঁচিয়ে বলল, "আমি কেমন করে বলব তুমি কে? তুমি বলো তুমি কে?"

তিতুনির মতো মেয়েটাকে বেশ চিন্তিত দেখাল, তিতুনি যেভাবে কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করে ঠিক সেভাবে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "আগে তুমি শুধু একা তিতুনি ছিলে। এখন আমি আর তুমি দুইজনেই তিতুনি। দুইটা তিতুনি।"

তিতুনি রেগে উঠে বলল, "না। দুইজন তিতুনি হয় না। একজন মানুষ কখনো দুইটা হয় না।"

"হয় না?"

"না।"

"কিন্তু এই যে হলো, তুমি এক তিতুনি আমি আরেক তিতুনি।"

তিতুনি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে সাবধানে বড় গাছটার পিছন থেকে বের হয়ে এলো। সাবধানে এক পা এগিয়ে এসে বলল, "তুমি বলো তুমি কে? বলো তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

মেয়েটা খানিকক্ষণ মাথা চুলকাল, তারপর খানিকক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বলল, "আমি ভেবেছিলাম আমিও তিতুনি। কিন্তু তুমি বলছ আমি তিতুনি না। তাহলে এখন আমি জানি না আমি কে।"

"তাহলে বলো তুমি কোথা থেকে এসেছ?" আস্তে আস্তে তিতুনির সাহস বেড়ে যেতে থাকে। তিতুনি যেটাই বলছে মেয়েটা সেটাই মেনে নিচ্ছে, তাই তার ভয়টাও কমে গিয়ে কৌতূহল বাড়তে থাকে।

মেয়েটা কোনো উত্তর না দিয়ে কেমন যেন একটু অস্বস্তি নিয়ে তিতুনির দিকে তাকিয়ে রইল। তিতুনি আবার বলল, "বলো, তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

মেয়েটা হাত তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে বলল, "ওই তো ওখান থেকে।"

"ওখান থেকে মানে? আকাশ থেকে?"

"বলতে পারো।"

"বলতে পারো মানে?" তিতুনি আরো এক পা এগিয়ে এলো, বলল, "পরিষ্কার করে বলো তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

তিতুনির মতো মেয়েটা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "পরিষ্কার করে বললে তুমি কিছুই বুঝবে না। তুমি তোমার সৌরজগতের গ্রহগুলো ছাড়া আর কিছুই জানো না। গ্যালাক্সির নাম শুনেছ কিন্তু সেটা কী তুমি জানো না। আকাশের তারাগুলো তুমি দেখেছ কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে তুমি কিচ্ছু জানো না। আমি কোথা থেকে এসেছি তোমাকে বোঝানো সম্ভব না।"

তিতুনি চোখ বড় বড় করে বলল, "তুমি এলিয়েন?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল। তিতুনি বলল, "কিন্তু এলিয়েনরা দেখতে আমার মতন হয় না।"

"কী রকম হয়?"

"সবুজ রঙের হয়। চোখগুলো বড় বড় হয়। মাথাটা অনেক বড় থাকে। হাত-পাগুলো সরু হয়। আঙুলগুলো লম্বা হয়। এক হাতে তিনটা করে আঙুল থাকে।"

তিতুনির মতো মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ জানি।"

"জানো?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তুমি আমার মতো কেন?"

"আমি তোমাকে প্রথম দেখেছি সে জন্যে তোমার মতো হয়েছি।"

তিতুনি ভুরু কুঁচকে বলল, "আরেকজনকে প্রথমে দেখলে তার মতো হতে?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল। তিতুনি বলল, "তাহলে তুমি যে রকম ইচ্ছা সে রকম হতে পারো?"

তিতুনির মতো মেয়েটা তার মাথা আর ঘাড় এমন করে নাড়ল, যার অর্থ হ্যাঁ কিংবা না দুটোই হতে পারে। তিতুনি যখন কোনো কিছু ঠিক করে বলতে চায় না তখন ঠিক এইভাবে মাথা নাড়ে–এই মেয়েটা কীভাবে জানি সেটা জেনে গেছে। তিতুনি বলল, "তুমি যখন একটা এলিয়েন তাহলে তুমি কেন আমার মতো হয়েছ? এলিয়েনের মতো হয়ে যাও।"

"নাহ্।" মেয়েটা মাথা নাড়ল।

"কেন না?"

"তোমার মতনই ভালো। এলিয়েনদের কী করতে হয় আমি জানি না। তুমি হলে কী করতে হয় জানি।"

তিতুনি চোখ বড় বড় করে বলল, "আমি হলে কী করতে হয় তুমি জানো?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে জানো?"

মেয়েটা একটু লজ্জা পাবার ভান করে বলল, "তোমার মাথার ভেতরে ঢুকে দেখেছি।"

তিতুনি প্রায় চিৎকার করে বলল, "তুমি কী বললে? আমার মাথার ভেতরে ঢুকে দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"আ-আ-আমার মাথার ভেতরে?" তিতুনির এখনো কথাটা বিশ্বাস হয় না। "তু-তুমি আমার মাথার ভেতরে ঢুকেছ?"

মেয়েটা একটু অপরাধীর মতো ভঙ্গি করে বলল, "হ্যাঁ।"

"এই একটু আগে যে আমার মাথাটা কেমন জানি ঘুরে উঠল, কেমন যেন মনে হলো মাথার ভেতরে কী হচ্ছে–তখন তুমি আমার মাথার ভেতরে ঢুকেছিল?"

"হ্যাঁ।" মেয়েটা প্রায় মাথা নিচু করে ফেলল, তাকে দেখে মনে হলো যেন সে খুব বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছে।

তিতুনি তখন আরো গরম হয়ে বলল, "তোমার এত বড় সাহস, তুমি আমার অনুমতি না নিয়ে আমার মাথার ভেতরে ঢুকেছ? আমার মাথায় যদি এখন কোনো সমস্যা হয় তাহলে তোমার খবর আছে বলে রাখলাম।"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, "সমস্যা হবে না। আমি কিছু ধরি নাই, কিছু ওলটপালট করি নাই। খালি দেখেছি।"

"কী দেখেছ?"

"এই তো তুমি কে, কী করো, কী চিন্তা করো–এই সব।"

তিতুনি বলল, "সব দেখেছ?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"বলো দেখি আমার ভাইয়ের নাম কী?"

"টোটন।"

"বলো দেখি আজকে সকালে কী হয়েছিল?"

"নাশতা খাবার সময় আমি যখন পানি খেতে যাচ্ছিলাম তখন ভাইয়া আমাকে ধাক্কা দিয়েছে, আর তখন হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে ভেঙে গেছে। তখন–"

তিতুনি হাত তুলে বলল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, তুমি কী বললে, আমি?"

"হ্যাঁ আমি। আমি যখন পানি খেতে–"

তিতুনি গরম হয়ে বলল, "মোটেও তুমি পানি খেতে যাচ্ছিলে না, তুমি হচ্ছ এলিয়েন–তুমি তখন কোথায় ছিলে আমি জানি না। আমি পানি খেতে যাচ্ছিলাম।" তিতুনি বুকে থাবা দিয়ে বলল, "আমি।"

"একই কথা।" তিতুনির মতো মেয়েটা বলল, "আমি আর তুমি একই কথা। এখন তুমি যা আমিও তাই। আমি তোমার মগজের দশ হাজার সাতশ' বার কোটি সাতাত্তর লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশ' ছেচল্লিশটা নিউরন কপি করে আমার মগজে রেখে দিয়েছি।"

তিতুনি কিছুক্ষণ হাঁ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, "কয়টা নিউরন?"

মেয়েটা আবার পুরো সংখ্যাটা বলল। তিতুনি বলল, "তুমি আমার মাথার ভেতরের সবগুলো নিউরন গুনেছ?"

"হ্যাঁ। না গুনলে কপি করব কীভাবে!"

তিতুনি কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে নিজেও বুঝতে পারল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কাজটা ঠিক হলো না।"

"কোন কাজটা ঠিক হলো না?"

"এই যে তুমি আমি হয়ে গেলে। যদি এখন কেউ তোমাকে দেখে ফেলে তখন কী হবে?"

মেয়েটা মাথা চুলকে বলল, "কী আর হবে? প্রথমে একটু অবাক হবে, তারপর মেনে নেবে। না মেনে উপায় কী? কখনোই তো বুঝতে পারবে না কে তুমি কে আমি। দুইজনেই তো হুবহু এক রকম।"

তিতুনি গরম হয়ে বলল, "কিন্তু তুমি এলিয়েন। এক্স-রে করলে দেখবে তোমার ভেতরে কিলবিল কিলবিল করছে শুঁড়ওয়ালা জিনিসপত্র। তোমাকে কাটলে সাদা রঙের রক্ত বের হবে, চুল ধরে টান দিলে পুরো চামড়া খুলে ভেতরে ভয়ংকর এলিয়েন বের হয়ে যাবে। আমি জানি।"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, "আমিও জানি। কিন্তু আমি সে রকম এলিয়েন না। আমার ভেতর কিলবিল করা কিছু নাই। আমি ঠিক তোমার মতো।"

"তুমি কেন আমার মতন হলে সত্যিকারের কিউট একটা এলিয়েনের চেহারা নাও, তাহলে তোমাকে আমি বাসায় নিয়ে যাব, স্কুলে নিয়ে যাব। তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকে টেলিভিশনে টক শোতে নিয়ে যাব।"

"টক শোতে?"

"হ্যাঁ। সেখানে তুমি কোথা থেকে এসেছ, কেমন করে এসেছ, সেগুলো বলতে পারবে। সবাই তোমাকে দেখার জন্যে ভিড় করে আসবে। তোমার সাথে সেলফি তুলবে।"

"সেলফি?"

"হ্যাঁ। ছোট বাচ্চারা তোমার অটোগ্রাফ নিবে।"

"অটোগ্রাফ?"

"হ্যাঁ।" তিতুনি গলায় জোর দিয়ে বলল, "তুমি এখন তোমার চেহারা পাল্টে ফেলো, কিউট একটা এলিয়েন হয়ে যাও।"

তিতুনির মতো দেখতে মেয়েটা খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "নাহ! আমি কিউট এলিয়েন হতে চাই না। আমি তিতুনিই থাকতে চাই।" তারপর কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াল, হাত দুটো উপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙল, ঠিক তিতুনি যে রকম করে।

তিতুনি একটু ভয়ে ভয়ে বলল, "তুমি এখন কোথায় যাবে?"

"তোমাদের পৃথিবীতে এসেছি, পৃথিবীটা একটু ঘুরে দেখি।"

"ঘুরে দেখবে? পৃথিবী?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি বাসায় যাবে না তো?"

মেয়েটা ভুরু কুঁচকে বলল, "কী হবে বাসায় গেলে?"

তিতুনি মাথা নাড়ল, বলল, "না। খবরদার তুমি বাসায় যাবে না। তুমি বাসায় গেলে অনেক ঝামেলা হবে।"

"কী ঝামেলা?"

"যখন বুঝতে পারবে তুমি এলিয়েন তখন পুলিশ-র‍্যাব এসে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। রিমান্ডে নিবে। তারপর কেটে-কুটে দেখবে।"

সবকিছু বুঝে ফেলেছে সে রকম ভাব করে মেয়েটা মাথা নাড়ল। তিতুনি একটু সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "তুমি যখন পৃথিবীটা দেখতে চাচ্ছ একটু দেখো। দেখা শেষ হলে চলে যেও। পৃথিবীতে থাকলেই কিন্তু ঝামেলা।"

"ঠিক আছে।" মেয়েটা এবারে বাসার দিকে হাঁটতে শুরু করে। তিতুনি তখন একেবারে হা হা করে উঠল, বলল "সর্বনাশ! তুমি করছ কী?"

"কী হয়েছে?"

"তুমি আমার বাসার দিকে যাচ্ছ কেন? বাসার লোকজন কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"তাহলে কোন দিকে যাব?"

"এই জঙ্গলের দিকে যাও। জঙ্গল পার হলে ধান ক্ষেত। ধান ক্ষেত পার হলে নদী। নদীর তীরে হাঁটলে তোমার খুব ভালো লাগবে।"

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।" তারপর জঙ্গলের দিকে হাঁটতে লাগল। তিতুনি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে আরো একজন তিতুনি হেঁটে হেঁটে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। কে জানে তার সাথে আর দেখা হবে কি না!

৩

বাসায় ফিরে এসে তিতুনি ছটফট করতে থাকল, ব্যাপারটা কাউকে বলা দরকার, কাকে বলবে? টোটনকে বলার প্রশ্নই আসে না, প্রথমত সে এটা বিশ্বাসই করবে না, তাকে নিয়ে টিটকারি করতে করতে বারোটা বাজিয়ে দেবে। যদি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করানো যায় তাহালে সেটা হবে আরো ভয়ংকর। তাহলে খুঁজে পেতে এলিয়েন মেয়েটাকে বের করে তাকে ধরে এনে ঘরের মাঝে বন্ধ করে দুনিয়ার যত লোক আছে তাদেরকে ডেকে আনবে মজা দেখার জন্যে। দুই টাকা করে টিকিট লাগিয়ে কিছু টাকা কামাই করে ফেলবে। তিতুনির উপরে তার যত রাগ সব ঝাড়বে এই এলিয়েন মেয়েটার উপরে।

তাহলে বাকি রইল আব্বু আর আম্মু। ঠিক তিতুনির মতো দেখতে একটা এলিয়েন মেয়ে এসেছে সেটা আম্মুকে বোঝানোই যাবে না। বাসার পিছনে জঙ্গলে নিয়ে যদি সেই গর্তটা দেখানো যায় তাহলে হয়তো বিশ্বাস করবেন এখানে কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু এখান থেকে আরেকটা তিতুনি বের হয়ে এসেছে সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করানো যাবে না। যদি সে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে তাহলে আম্মু হয়তো তাকে ধরে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করিয়ে লবণ পানি খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখবেন। শুধু তা-ই না, তার হয়তো বাসার পিছনে জঙ্গলে যাওয়াটাই বন্ধ হয়ে যাবে। আব্বুকে যদি বলার চেষ্টা করে তাহলে আব্বু হয়তো পুরোটা শুনবেন, শুনে বলবেন, "ভেরি গুড তিতুনি। খুবই চমৎকার একটা গল্প তৈরি করেছ। এখন গল্পটা প্রথমে বাংলায় লিখে ফেলো। তারপর সেটাকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করে ফেলো।"

তাদেরকে বিশ্বাস করানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে এলিয়েন মেয়েটাকে বাসায় নিয়ে আসা–নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস করবেন কিন্তু সেটা হবে খুবই ভয়ংকর। আম্মু একটা টিকটিকি দেখলেই চিৎকার করতে থাকেন, একবার বাসায় একটা ঢোঁড়া সাপ ঢুকে গিয়েছিল, সেটা দেখে প্রায় ফিট হয়ে গিয়েছিলেন। তিতুনির পাশে আরেকটা তিতুনি দেখলে তার কী অবস্থা হবে কে জানে। নির্ঘাত দাঁতে দাঁত লেগে ফিট হয়ে যাবেন। কে জানে হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। আব্বুর অবস্থা আরো খারাপ–আব্বু ভাব দেখান তার সাহস বেশি মাথা ঠাণ্ডা কিন্তু আসলে সেটা সত্যি না, আব্বু আরো বেশি ভীতু। একটা-দুইটা তেলাপোকা দেখলেই আঁৎকে ওঠেন। রাতে যদি শেয়াল ডাকে আব্বু ভয় ভয় চোখে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকেন। তিতুনির পাশে আরেকটা তিতুনি দেখলে আব্বুর খবর হয়ে যাবে। এলিয়েন তিতুনির সাথে সাথে আসল তিতুনিকেই ছেড়ে-ছুড়ে চলে যাবেন। তাই কাউকেই এলিয়েন তিতুনির খবর বলা যাবে না। এলিয়েন তিতুনি তার গ্যালাক্সিতে ফিরে যাবার পরও বলা যাবে না–কেউ তো বিশ্বাসই করবে না, ধরে নেবে তিতুনির মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কাজেই তিতুনি কাউকেই কিছু বলল না। কিন্তু কাউকে কিছু না বললেও সে সারাটি দিনই ছটফট করে বেড়াল। তিতুনির মতো দেখতে এলিয়েন মেয়েটা কোথায় গিয়েছে কে জানে? একা একা আবার কোনো বিপদে না পড়ে যায়। তিতুনি যে ছটফট করছিল সেটা প্রথমে লক্ষ করলেন আম্মু। বিকালের দিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর হয়েছেটা কী?"

তিতুনি জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "কিছু হয় নাই, কিছু হয় নাই।"

"তাহলে এ রকম করছিস কেন?"

"কী রকম করছি?"

"ছটফট ছটফট করছিস–একবার ঘরে আসিস একবার বের হোস। একবার ছাদে যাস আবার নিচে নামিস। দুপুরে খেলি না পর্যন্ত ঠিক করে।"

তিতুনি দুর্বল গলায় বলল, "খেয়েছি তো।"

"বল ঠিক করে তোর কী হয়েছে?"

"কিছু হয় নাই আম্মু।"

টোটন কাছাকাছি ছিল, সে বলল, "তিতুনিকে চোখে চোখে রাখা দরকার। নিশ্চয়ই কিছু একটা বদ মতলব আছে।"

অন্য সময় হলে তিতুনি টোটনের এই কথার উত্তরে কিছু একটা বলত, কিন্তু এখন সে কিছুই বলল না, টোটনের দিকে তাকাল কিন্তু টোটনকে দেখল বলেই মনে হলো না।

আম্মু তখন নরম গলায় বললেন, "সকালে তোকে বকেছি বলে মন খারাপ করে আছিস?"

তিতুনি জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "না আম্মু, আমার বেশিক্ষণ মন খারাপ থাকে না।"

"তাহলে?"

"কিছু না আম্মু, কিছু না।" বলে তিতুনি সরে গেল।

সন্ধ্যের ঠিক আগে আগে তিতুনি বাসার পিছনে সেই গর্তটার কাছে গেল, গাছে কিছু পাখি কিচমিচ করছে কিন্তু আর কেউ নেই। গর্তটার ভেতরেও একবার উঁকি দিল, সেখানেও কেউ নেই। তিতুনির মতো দেখতে মেয়েটা পৃথিবী ঘুরতে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। হয়তো তার পৃথিবী দেখা শেষ হয়েছে, হয়তো তার গ্যালাক্সিতে ফিরে গেছে।

রাত্রে খাওয়া শেষ করে তিতুনি তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে। এই বাসায় তার আলাদা একটা ঘর আছে–ঘরটা ছোট, একটা বিছানা আর ছোট একটা পড়ার টেবিল ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই, তার পরও এটা তিতুনির খুব প্রিয় একটা জায়গা, তার কারণ ঘরটা তার নিজের, তার চেয়ে বড় কথা ঘরটার মাঝে একটা জানালা আছে, সেই জানালা দিয়ে তিতুনি বাইরে তাকাতে পারে। যখন তার মন খারাপ হয় তখন এই জানালা দিয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আজকে ঠিক মন খারাপ নেই কিন্তু ভেতরে একধরনের উত্তেজনা, তাই সে অনেকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

তিতুনি মশারি টানিয়ে শুতে যাবার সময় হঠাৎ শুনতে পেল দরজায় কেউ বেল বাজিয়েছে। এত রাতে কে আসতে পারে তিতুনি আন্দাজ করতে পারল না, তাই কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। শুনল আব্বু বলছেন, "টোটন দেখ দেখি এত রাতে কে এসেছে।"

টোটন নাক দিয়ে বিরক্তির মতো একটা শব্দ করল। তারপর গিয়ে দরজা খুলল, তিতুনি শুনল দরজা খুলেই টোটন বিচিত্র একটা শব্দ করে বলল, "আরে, তিতুনি? তুই? তুই বাইরে?"

আসল তিতুনির হাত-পা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল–এলিয়েন তিতুনি এসেছে। তাকে না করে দেওয়ার পরও সে এসেছে। সর্বনাশ! এখন কী হবে?

তিতুনি দরজায় কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করল।

টোটনের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে এলিয়েন তিতুনি ঘরে ঢুকে গেল। টোটন তখন আরো জোরে চিৎকার করে বলল, "কী হলো কথা বলিস না কেন?"

এলিয়েন তিতুনি কথা না বলে টোটনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসার ভঙ্গি করল। টোটন রেগেমেগে চিৎকার করে বলল, "আম্মু দেখো, তিতুনি আমাকে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে।"

আম্মু এসে এলিয়েন তিতুনির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোকে না তোর ঘরে যেতে দেখলাম! তুই আবার বাইরে গেলি কখন?"

এলিয়েন তিতুনি (যদিও সে আসল তিতুনি না কিন্তু কারো পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব না)–বলল, "এই তো একটু আগে। তোমাদের সবার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলাম।"

আম্মু বললেন, "খেয়াল করিনি।"

এলিয়েন তিতুনি বলল, "আমি জানি। এই বাসায় আমাকে কেউ খেয়াল করে না। আমি আছি কী নেই তাতে কারো কিছু আসে-যায় না।"

নিজের ঘরের দরজায় কান পেতে আসল তিতুনি অবাক হয়ে শুনল এলিয়েন তিতুনি গলার স্বরে একধরনের অভিমানের সুর ফুটিয়ে তুলেছে এবং সেটা শুনে আম্মু পর্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছেন।

তিতুনির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "পাগলি মেয়ে, কে বলেছে তোকে আমরা কেউ খেয়াল করি না? সকালে তোকে বকাবকি বেশি করেছি সেই জন্যে এখনো আমার উপর রাগ করে আছিস?"

এলিয়েন তিতুনি একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "না আম্মু, আমি রাগ করি না। এই বাসায় আমি কে? আমি কার উপরে রাগ করব? মাঝে মাঝে একটু দুঃখ পাই কিন্তু কখনো রাগ করি না।"

গলার স্বরে এতই গভীর বেদনা যে আম্মুর চোখে একেবারে পানি এসে গেল, এলিয়েন তিতুনিকে একেবারে বুকে চেপে ধরে বললেন, "ছিঃ তিতুনি। মায়ের উপর রাগ করতে হয় না। ছিঃ মা!"

অন্য-তিতুনি কিছু বলল না, কখনো কখনো কথা না বলাটাই কথা বলা থেকে বেশি কাজে দেয়। এবারেও কাজে দিল, আম্মুর চোখে আগেই পানি চলে এসেছিল, এবারে একেবারে গলা ভেঙে গেল। ভাঙা গলায় বললেন, "বল মা, কেন তুই এত রাতে বাসা থেকে বের হয়েছিলি?"

অন্য-তিতুনি কথা বলল না।

"আমার উপর রাগ করে বের হয়ে গিয়েছিলি?"

এলিয়েন তিতুনি এবারেও কথা বলল না, মাথাটা আরো নিচু করল। আম্মু তিতুনির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আর কখনো এ রকম পাগলামি করবি না। ঠিক আছে?"

এলিয়েন তিতুনি মাথা নাড়ল। আম্মু তখন অন্য-তিতুনিকে ছেড়ে দিলেন। অন্য-তিতুনি হেঁটে হেঁটে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল। টোটন গজগজ করতে করতে অন্য-তিতুনির দিতে তাকিয়ে বলল, "বেশি আদর দিয়ে তোর মাথা নষ্ট করা হয়েছে আর কিছু না। আমি একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তুই সামনে দিয়ে যাসনি, গেলে আমি দেখতাম।"

অন্য-তিতুনি বলল, "আমি তাহলে কোন দিক দিয়ে গিয়েছি?"

"নিশ্চয়ই জানালা দিয়ে বের হয়েছিলি। তোর ঘরে জানালার শিক নিশ্চয়ই তুই খুলে রেখেছিস।"

অন্য-তিতুনি দাঁত বের করে হাসল, সেটা দেখে টোটন গরম হয়ে বলল, "খবরদার, মুখ ভ্যাংচাবি না।"

"আমি মুখ ভ্যাংচাচ্ছি না, তোমার কথা শুনে হাসছি।"

এলিয়েন তিতুনি তার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যখন দরজা ধাক্কা দিল তখন হঠাৎ করে আসল তিতুনির মনে পড়ল সে দরজাটার ছিটকিনি লাগিয়ে রেখেছে। দরজাটা যে ভেতর থেকে বন্ধ সেটা সাথে সাথে টোটনের চোখে পড়েছে। সে চিৎকার করে বলল, "মিথ্যুক। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, তুই বের হলি কেমন করে?"

ঘরের ভেতর থেকে ছিটকিনি খুলে আসল তিতুনি সরে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই টোটন লাথি দিয়ে দরজা খুলে ফেলেছে। টোটন দেখল খোলা দরজার সামনে ঘরের ভেতর একজন তিতুনি আর দরজার বাইরে আরেকজন।

টোটন গগনবিদারি একটা চিৎকার দিয়ে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে ছুটে যেতে গিয়ে ঘরের সামনেই আছাড় খেয়ে পড়ল।

সেই আছাড় খাওয়ার শব্দে মনে হয় পুরো বাসা কেঁপে উঠল।

৪

তিতুনি কী করবে সেটা নিয়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল, তারপর হাত বাড়িয়ে এলিয়েন তিতুনিকে খপ করে ধরে ভেতরে টেনে আনল। সে যে ফ্রকটা পরে আছে এলিয়েন তিতুনিও একই ফ্রক পরে আছে, কাজেই দুইজন বদলাবদলি করলে কেউ ধরতে পারবে না।

তিতুনি এলিয়েন তিতুনির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "তুমি ঘরের ভেতরে লুকিয়ে থাকো। বের হয়ো না।"

এলিয়েন তিতুনি মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল, যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সব বাসাতেই যেন দুইটি করে তিতুনি থাকে, একজন বাইরে কথাবার্তা বলে আরেকজন ঘরের ভেতরে লুকিয়ে থাকে।

ঘর থেকে বের হয়ে তিতুনি টোটনের কাছে গেল, টোটন হাঁচড়-পাঁচড় করে কোনোভাবে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। তিতুনি তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? ভাইয়া তোমার কী হয়েছে?"

টোটন তিতুনিকে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে ঝটকা মেরে তিতুনির হাতটা সরিয়ে একটা লাফ দিয়ে সরে গেল, তোতলাতে তোতলাতে বলল, "তু-তু-তু-তুই! তু-তু-তুই?"

"আমি?" তিতুনি কিছুই বুঝতে পারে নাই সে রকম ভান করে বলল, "আমি কী?"

ততক্ষণে আব্বু আর আম্মুও ছুটে চলে এসেছেন।

ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

তিতুনি বলল, "জানি না।"

টোটন তিতুনির দিকে আঙুল তুলে বলল, "তি-তি-তি..." কিন্তু কথাটা শেষ করল না, সে যে তিতুনি বলার চেষ্টা করছে সেটা বুঝতে অবশ্যি কারো সমস্যা হলো না।

আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে তিতুনির?"

টোটন এবার খানিকটা সামলে নিয়েছে। তিতুনিকে দেখে সে কেমন জানি ভয় পেয়ে গেল, একটু সরে গিয়ে বলল, "দু-দুইটা তিতুনি।"

কথাটার অর্থ তিতুনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারল না। তিতুনি অবশ্য তার আব্বু আর আম্মুর মতো ভান করল সেও টোটনের কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। বলল, "দুইটা আমি?"

"হ্যাঁ", টোটন বলল, "তুই দুইটা।"

আব্বু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "তিতুনি দুইটা? তার মানে কী?"

টোটন বলল, "একটা তিতুনি ঘরের ভেতরে। আরেকটা বাইরে।"

আব্বু আর আম্মু একজন আরেকজনের দিকে তাকালেন, তারপর তিতুনির দিকে তাকালেন, তিতুনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল সে কিছুই বুঝতে পারছে না। আম্মু টোটনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "একজন মানুষ দুইটা কেমন করে হয়?"

টোটন বলল, "আমি দেখেছি। দুইটা তিতুনি।"

আম্মু বললেন, "কোথায় দেখেছিস?"

টোটন তিতুনির ঘরের দিকে দেখিয়ে বলল, "ঘরের ভেতরে।"

তিতুনি এইবারে হাসার ভঙ্গি করল, তারপর বলল, "ভাইয়ার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

টোটন গর্জন করে বলল, "মাথা খারাপ হয় নাই। আমি স্পষ্ট দেখেছি।"

"তাহলে ভাইয়া গাঞ্জা খেয়ে এসেছে।"

টোটন আরো জোরে গর্জন করে উঠল, বলল, "আমি গাঞ্জা খাই নাই।"

"তাহলে ইয়াবা।"

টোটন এবারে কোনো কথা বলল না, শুধু হিংস্র চোখে তিতুনির দিকে তাকাল। তার চোখ থেকে আগুন বের হতে থাকল।

আব্বু চিন্তিত মুখে বললেন, "কী হয়েছে বোঝা দরকার। টোটন বাবা তুমি পরিষ্কার করে বলো দেখি তুমি কী দেখেছ।"

টোটন বলল, "আমি দেখেছি দুইটা তিতুনি। একটা ঘরের ভেতরে আরেকটা বাইরে।"

"দুইটা তিতুনি মানে কী?"

টোটন কেমন জানি অধৈর্য হয়ে বলল, "দুইটা মানে দুইটা। এক দুই। ওয়ান টু।"

আব্বু বললেন, "একজন মানুষ দুইটা হয় কেমন করে?"

টোটন যুক্তি-তর্কের দিকে গেল না, বলল, "হয়েছে। আমি দেখেছি।"

তিতুনি বলল, "হয় নাই। তুমি তবু দেখেছ। তুমি তো আমাকে একেবারে সহ্য করতে পারো না তাই সব জায়গায় আমাকে দেখো। তোমার মনের ভুল।"

আম্মু মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ। মনের ভুল।"

আব্বু বললেন, "কিংবা চোখের ভুল।"

তিতুনি বলল, "মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢাললে মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে।" আম্মুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠাণ্ডা পানি আনব?"

টোটন রেগে বলল, "না। তোর ঠাণ্ডা পানি আনতে হবে না।"

তিতুনি বলল, "তাহলে লবণ পানি। লবণ পানি খেলে মাথা ঠাণ্ডা হয়।"

টোটন দাঁত কিড়িমিড়ি করে বলল, "লাগবে না লবণ পানি।"

তিতুনি মুখটা গম্ভীর করে বলল, "আম্মু। আমার মনে হয় ভাইয়াকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।"

আম্মু চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন। আব্বু বললেন, "একটা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেই হবে। সকালবেলা ঠিক হয়ে যাবে।"

টোটন বলল, "আমার ঘুমের ওষুধ খেতে হবে না। আমার কিছু হয় নাই। আমি দেখেছি এই ঘরের ভেতরে আরেকটা তিতুনি আছে।"

তিতুনি মুখ গম্ভীর করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, "ভাইয়া পাগল হয়ে যাচ্ছে।"

আব্বু বললেন, "আমার কী মনে হচ্ছে জানো?"

আম্মু আর তিতুনি একসাথে জিজ্ঞেস করল, "কী?"

"টোটন যেহেতু একেবারে জোর দিয়ে বলছে ঘরের ভেতরে আরেকটা তিতুনি আছে আমাদের তিতুনির ঘরে গিয়ে টোটনকে দেখানো উচিত যে আসলে সেখানে কিছু নাই। তখন টোটন বিশ্বাস করবে।"

তিতুনির মুখটা হাঁ হয়ে গেল। তোতলাতে তোতলাতে বলল, "আ-আ-আমার ঘরে?"

"হ্যাঁ তোর ঘরের দরজাটা খোল দেখি।"

তিতুনি আঁতকে উঠল, "দরজা খুলব?"

"হ্যাঁ। টোটনকে দেখাই তোর ঘর ফাঁকা। আর কেউ নাই।"

তিতুনি জানে তার ঘর মোটেও ফাঁকা নয়, তার ঘরে এলিয়েন তিতুনি বসে আছে। ঘরে ঢুকলেই তাকে পেয়ে যাবে। তখন কী ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘটবে! বোঝা যাবে টোটনের কথাটাই সত্যি, আসলেই তিতুনি দুইজন। কোনটা খাঁটি কোনটা ভেজাল? কেমন করে কী বোঝাবে? যদি এলিয়েন তিতুনিকে খাঁটি মনে করে তাকে বিদায় করে দেয় তখন কী হবে? ভয়ে-আতঙ্কে তিতুনির হাত-পা কাঁপতে থাকে। সে দুর্বলভাবে তার আব্বুকে থামানোর চেষ্টা করল, বলল, "আব্বু আমার ঘরে তোমাদের যাওয়া মনে হয় ঠিক হবে না।"

আব্বু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কেন?"

"মানে ইয়ে তাহলে–", তিতুনি কী বলবে বুঝতে পারছিল না, একটু ইতস্তত করে বলল, "তাহলে ভাইয়ার কথাকে বিশ্বাস করা হলো। ভাইয়াকে বোঝানো হলো উল্টাপাল্টা জিনিস বলা যায়–ভাইয়া আরো বেশি উল্টাপাল্টা জিনিস বলবে। কোনোদিন হয়তো বলবে–"

"কী বলবে?"

"বলবে আমি একটা এলিয়েন।"

"এলিয়েন?" আব্বু চোখ কপালে তুলে বললেন, "এলিয়েন? তোকে এলিয়েন কেন বলবে?"

আম্মু বললেন, "এত সব কথা না বলে টোটনকে নিয়ে তিতুনির ঘরে ঢুকে তাকে দেখাও, তাহলে টোটন শান্ত হবে।"

টোটন কাঁপা গলায় বলল, "আমি ঢুকতে চাই না। আমার ভয় করে।"

আব্বু অবাক হয়ে বললেন, "ভয় করে? কিসের ভয়?"

টোটন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "জানি না।"

আম্মু বললেন, "কোনো ভয় নাই। আয় আমার সাথে।"

তারপর টোটনের হাত ধরে তিতুনির ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রথমে আম্মু, তারপর আব্বু, সবার শেষে টোটন। তিতুনি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, যেকোনো মুহূর্তে তার ঘরের ভেতর থেকে ভয়ংকর একটা চিৎকার শোনা যাবে। সবাই আতঙ্কে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে আসবে। তখন সে কী করবে?

তিতুনি তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ভয়ংকর চিৎকারের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। এক সেকেন্ড, দুই সেকেন্ড, তিন সেকেন্ড–কোনো চিৎকার নেই। দশ সেকেন্ড, বিশ সেকেন্ড, তিরিশ সেকেন্ড–তবু কোনো চিৎকার নেই, বরং খুবই নিরীহ কথা শোনা গেল। আব্বু বললেন, "দেখলি টোটন, এখানে কোনো তিতুনি নেই।"

আম্মু বললেন, "কেমন করে থাকবে? এটা কি সম্ভব?"

টোটন বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল, তিতুনি সেই কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না।

আব্বু বললেন, "আর কত দেখবি? সব তো দেখা হলো।"

আম্মু বললেন, "এখন বিশ্বাস হলো?"

টোটন আবার বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল। তিতুনি এই কথাটাও বুঝতে পারল না। কিন্তু এতক্ষণে তার ভেতরে সাহস ফিরে এসেছে, সে তখন তার ঘরে ঢুকল। ঘরের ভেতর টোটন তখন নিচু হয়ে তার খাটের তলাটা দেখছে। তিতুনি বলল, "ভাইয়া, পেয়েছ আরেকজন তিতুনি?"

টোটন গরগর করে কিছু একটা বলল, যার অর্থ যা কিছু হতে পারে।

তিতুনি সাবধানে চারিদিকে তাকাল, এলিয়েন তিতুনির কোনো চিহ্ন নেই। তিতুনির ভয় কেটে গেছে, সে এবার টোটনকে জ্বালাতে শুরু করল, বলল, "ভাইয়া আমার ব্যাক পেকের ভেতরে দেখতে চাও?"

টোটন বলল, "চুপ কর। পাজি মেয়ে।"

"বালিশের তলায় দেখেছ? ড্রয়ারের ভেতরে?"

টোটন চোখ লাল করে ফেলল, "ফাজলেমি করবি না। খবরদার।"

তিতুনি বলল, "কে ফাজলেমি করছে? আমি না তুমি? যদি বলো আমি ছাড়া আরো একজন তিতুনি আছে তাহলে সেটা ফাজলেমি হলো না?"

আম্মু বললেন, "থাক থাক, অনেক হয়েছে।"

আব্বু বললেন, "টোটন, যাও গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

টোটনকে খুবই বিমর্ষ দেখাল, বলল, "আমি স্পষ্ট দেখলাম।"

আব্বু বললেন, "যত স্পষ্টই দেখো, এটা সত্যি হতে পারে না। এটা হয় চোখের ভুল না হয় মনের ভুল।"

তিতুনি বলল, "কিংবা মগজের গোলমাল।"

টোটন চোখ লাল করে তিতুনির দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না, সে এখন আসলেই মনে করতে শুরু করছে যে তার মগজে গোলমাল হতে শুরু করেছে।

তার ঘর থেকে সবাই বের হয়ে যাবার পর তিতুনি দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে তার বিছানার উপরে বসে এদিক-সেদিক তাকাল। সামনের দরজাটা ছাড়া এই ঘর থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই, আবার মেয়েটা এই ঘরেও নেই। তাহলে মেয়েটা গেল কোথায়?

ঠিক তখন শুনল ফিসফিস করে মেয়েটা তাকে ডাকছে, "তিতুনি! এই তিতুনি।"

তিতুনি চমকে উঠে এদিক-সেদিক তাকাল, মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে না, কোথা থেকে কথা বলছে?

"এই যে। আমি এইখানে।"

তিতুনি গলার স্বর লক্ষ্য করে উপরের দিকে তাকাল এবং উপরের দৃশ্যটি দেখে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মাথার ওপরে ফ্যানটা ফুল স্পিডে ঘুরছে, তার উপরে ফ্যানের রডটা ধরে গুটিশুটি মেরে মেয়েটি বসে আছে। কোনোভাবে যদি হাত ফসকে যায় তাহলে ফ্যানের ব্লেডের উপর পড়বে, তখন কী অবস্থা হবে সে চিন্তাও করতে পারে না।

আব্বু-আম্মুকে নিয়ে টোটন এই ঘরের সব জায়গায় মেয়েটাকে খুঁজেছে, কিন্তু তাদের কারো মাথায় একবার উপরে তাকানোর কথা মনে হয়নি। কেন তাকাবে, একজন মানুষ যে ঘুরন্ত ফ্যানের রড ধরে ঝুলে থাকতে পারে, সেটা কি কেউ কখনো চিন্তা করতে পারে?

মেয়েটা ফিসফিস করে বলল, "তিতুনি। ফ্যানটা একটু বন্ধ করো।"

তিতুনি তখন দৌড়ে ফ্যান বন্ধ করল। ফ্যানের ব্লেডগুলো থেমে যাবার আগেই মেয়েটা রড থেকে ঝুলে মেঝেতে নেমে এলো। হাত দিয়ে শরীর পরিষ্কার করতে করতে তিতুনির দিকে এমনভাবে তাকাল যেন এটা খুবই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

তিতুনি হাঁ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "তু-তুমি ওখানে উঠেছ কেমন করে?"

তিতুনি যে রকম করে কাঁধ ঝাঁকায় মেয়েটা ঠিক সেভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "চেষ্টা-মেস্টা করে।"

"কী রকম চেষ্টা-মেস্টা?"

"তুমি হলে যে রকম উঠতে আমি সে রকম করে উঠেছি।"

"আমি মোটেও ফ্যানের উপরে উঠে বসে থাকতাম না।"

মেয়েটা তিতুনির কথা মেনে নিয়ে একটা হাই তুলল। তিতুনি কেন জানি একটু রেগে ওঠে। রেগে উঠলে গলা উঁচিয়ে চিৎকার করে কথা বলতে হয় কিন্তু এখন ফিসফিস করে কথা বলতে হচ্ছে, তাই রাগটা পুরোপুরি বোঝানো গেল না। হাত-পা নেড়ে ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে আমি একশ'বার বলেছি বাসায় আসবে না বাসায় আসবে না–তারপরেও তুমি বাসায় কেন চলে এসেছ?"

"অনেকক্ষণ বাসায় কাউকে দেখি না, তাই কী রকম মন কেমন কেমন করছিল।"

তিতুনি চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললে? বাসায় কাউকে দেখো না? তুমি কোথাকার একজন এলিয়েন আর আমার বাসার মানুষের জন্য তোমার মন কেমন কেমন করে?"

এলিয়েন মেয়েটা মাথা নাড়ল। তিতুনি আরো রেগে বলল, "ঢং করো?"

মেয়েটা না-সূচকভাবে মাথা নেড়ে বলল, "নাহ্। ঢং করি না। এখন তো আমি হচ্ছি তুমি। সারাদিন বন-জঙ্গল, মাঠঘাট, নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়ালে তোমার বাসার মানুষের জন্যে মন খারাপ করত না?"

তিতুনি অস্বীকার করতে পারল না যে তারও মন খারাপ হতো কিন্তু তারপরও বিষয়টা মেনে নেওয়া তার জন্যে সহজ হলো না।

তিতুনির মতো মেয়েটা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "তা ছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে।"

তিতুনি জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

"অন্ধকার হবার পর কেমন জানি ভয় ভয় করতে লাগল।"

"ভয়?" তিতুনি অবাক হয়ে বলল, "কীসের ভয়?"

মেয়েটা একেবারে সরল মুখে বলল, "ভূতের।"

তিতুনি আরেকটু হলে একটা চিৎকার করে উঠছিল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে সামলে ফিসফিস করে বলল, "তুমি ভূতকে ভয় পাও?"

মেয়েটা বলল, "তুমি ভয় পাও দেখেই তো আমি ভয় পাই। আমি হচ্ছি তুমি।"

তিতুনি কী বলবে বুঝতে পারল না। খানিকক্ষণ হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "দেখো মেয়ে, তোমার জন্যে আমার কিন্তু অনেক বড় বিপদ হতে পারে।"

"কী বিপদ?"

"যদি কোনোভাবে কেউ তোমার কথা জেনে যায়, তাহলে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবেই। তোমার জায়গায় আমাকে ধরে নিয়ে

যাবার চান্স ফিফটি ফিফটি। যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায় তখন কী হবে?"

মেয়েটা মাথা চুলকে বলল, "কেটেকুটে দেখবে। মনে হয় ইলেকট্রিক শক দিবে। ব্রেনটা খুলে খুলে দেখবে।"

"তাহলে?"

মেয়েটাকে কিছুক্ষণ চিন্তিত দেখায়, তারপর হঠাৎ চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, "যেটা হয় নাই সেটা নিয়ে চিন্তা করে কী হবে? যখন হবে তখন দেখা যাবে।"

তিতুনি অবশ্যি এত সহজে ছেড়ে দিল না, ফিসফিস করে বলল, "তোমার কাজটা ঠিক হয় নাই।"

"কোন কাজটা?"

"এই যে আমার মতো চেহারা করেছ। অন্য রকম চেহারা করলে কী হতো?"

মেয়েটা অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, "তোমাকে প্রথম দেখলাম, পছন্দ হলো–"

তিতুনি হাত নেড়ে বলল, "পছন্দের খেতা পুড়ি।"

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করে থাকে। মেয়েটা একসময় বলল, "যখন সকাল হবে তখন আমি না হয় চলে যাব।"

"কোথায়?"

"এই তো এদিক-সেদিক। এসেছি যখন পৃথিবীটা একটু ঘুরে দেখি।"

তিতুনি মাথা নাড়ল, বলল, "সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার কী? এখনই যাও। আমার ঝামেলা মিটে যায়।"

মেয়েটা জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, "না বাবা। ভয় করে।"

"সকালবেলা কেমন করে যাবে? যদি আম্মু না হয় আব্বু দেখে ফেলে তখন কী হবে?"

"দেখবে না। খুব সকালে কেউ ঘুম থেকে ওঠার আগে চলে যাব।"

তিতুনি বলল, "মনে থাকে যেন।"

"মনে থাকবে।"

তিতুনি একটু ইতস্তত করে বলল, "দেখো তুমি মনে কোরো না যেন আমি তোমাকে বাসা থেকে বের করে দিচ্ছি।"

মেয়েটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "দিচ্ছই তো।"

"না।" তিতুনি মাথা নাড়ল, বলল, "তুমি একজন এলিয়েন মানুষ, তুমি কত কী করতে পারো। আমি তো আর কিছু করতে পারি না। তোমার মতন দেখতে বলে যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায় শুধু সেই জন্যে–বুঝেছ?"

এলিয়েন মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

তিতুনি গলার স্বরটা একটু নরম করে বলল, "তুমি আমার উপরে রাগ হওনি তো?"

"নাহ্। নিজের উপর নিজে রাগ হবে কেমন করে? তুমি আর আমি তো একই।" বলে মেয়েটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর সেটা দেখে তিতুনির একটু মন খারাপ হলো।

৫

সকালবেলা হইচই-চেঁচামেচি শুনে তিতুনির ঘুম ভাঙল। সে ধড়মড় করে উঠে বসে এদিক-সেদিক তাকায়, মেয়েটা কোথাও নেই। তিতুনি বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে দেখল, বিছানার নিচে এবং ফ্যানের উপরেও দেখল। সেখানেও নাই, তখন দরজার দিকে তাকাল, দরজার ছিটকিনি খোলা, তার মানে মেয়েটা ঘর থেকে বের হয়েছে। এই মেয়েটার কারণেই কী হইচই? তিতুনি কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, দরজা খোলাসংক্রান্ত একটা বিষয় নিয়ে আম্মু চিৎকার করছেন। তিতুনি তখন সাবধানে ঘর থেকে বের হলো, বাইরের ঘরে এসে উঁকি দিল।

আম্মু চিৎকার করে বলছেন, "এই বাসায় সব দায়িত্ব আমার? দরজা খোলা রেখে সব মানুষ ঘুমিয়ে গেল? এইটা কী একটা বাসা নাকি হোটেল?"

তিতুনি পরিষ্কার করে বুঝতে পারল না দরজা খোলার সাথে হোটেলের কী সম্পর্ক। এখন সেটা নিয়ে কথা বলাটাও অবশ্যি ঠিক হবে না। দরজাটা কেন খোলা সেটাও তিতুনি বুঝতে পারল। কেউ ঘুম থেকে ওঠার আগে তিতুনির মতো দেখতে এলিয়েন মেয়েটা দরজা খুলে বের হয়ে গেছে।

আম্মু বললেন, "কেন সবকিছু আমাকে দেখতে হবে? আমি একদিন দেখলাম না আর সবাই দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়ে গেল?"

আব্বুও ঘুম ঘুম চোখে উঠে এসেছেন, বললেন, "আমার স্পষ্ট মনে আছে দরজার ছিটকিনি লাগানো–"

আম্মু আব্বুকে কথা শেষ করতে দিলেন না, বললেন, "তোমার মনে থাকলেই তো হবে না। দরজার ছিটকিনি লাগানো থাকলে সেটা খুলল কে? ভূত?"

আম্মু আরো কথা বলতে থাকলেন, তখন তিতুনি সরে এলো। হাত-মুখ ধুয়ে স্কুলের ড্রেস পরতে গিয়ে আবিষ্কার করল সেটা নাই। এলিয়েন মেয়েটি সকালবেলা তার স্কুলের পোশাক পরে বের হয়ে গেছে। কী সর্বনাশ! সে কী এখন তার স্কুলে হাজির হয়ে যাবে?

তিতুনি খুঁজে তার অন্য পোশাকটা বের করে সেটা পরল। একটু ময়লা হয়ে আছে, ধোয়া দরকার কিন্তু এখন সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার সময় নেই।

খাবার টেবিলে সবাই যখন নাশতা খেতে বসেছে তখন আম্মু হঠাৎ করে একটুখানি হাসি এবং একটুখানি অবাক মুখ করে তিতুনিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা! তোর গত রাতে হয়েছিলটা কী?"

তিতুনির কী হয়েছিল সে জানে না। ভেতরে ভেতরে সে ভয়ানক চমকে উঠল। নিশ্চয়ই গত রাতে এলিয়েন তিতুনি কিছু একটা করেছে, সেটা সে জানে না। এটা যদি সবাই বুঝে ফেলে তাহলে বিপদ, আবার আম্মুর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে–না দিলে সেটাও বিপদ। কী করবে বুঝতে না পেরে সে মুখের মাঝে খানিকটা লজ্জা খানিকটা ড্যাম কেয়ার ভাব নিয়ে বসে রইল।

টোটন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছিল আম্মু? তিতুনি কী করেছিল?"

আম্মু একবার তিতুনির মুখের দিকে তাকালেন তারপর অন্যদের দিকে তাকালেন, বললেন, "রাত্রে হঠাৎ দেখি ঘরে আলো জ্বলছে, টুং টাং শব্দ। উঠে এসে দেখি ফ্রিজ খুলে খাবার বের করে তিতুনি খাচ্ছে।"

টোটন এমন একটা মুখের ভঙ্গি করল যেন খাওয়াটা একটা খুবই জঘন্য কাজ। মুখটা বিকৃত করে বলল, "খাচ্ছে?"

"হ্যাঁ। সে কী খাওয়া। আমি অবাক হয়ে গেলাম–তোর হয়েছিল কী? গভীর রাতে এত খিদে লেগে গেল?"

তিতুনি কোনোমতে মুখে একটা স্বাভাবিক ভাব ধরে রেখে বলল, "হ্যাঁ আম্মু, রাত্রে হঠাৎ কেন জানি খিদে লেগে গেল!"

"খিদে লেগেছে তো আমাকে ডেকে তুলে সেটা বল। খাবার গরম করে দিই। ঠাণ্ডা ভাত-তরকারি যেভাবে গপগপ করে খাওয়া শুরু করলি!"

তিতুনি কিছু বলল না। আব্বু বললেন, "গ্রোয়িং স্টেজ তো, এ রকম হয়। বাচ্চারা ধীরে ধীরে বড় হয় না–হঠাৎ হঠাৎ বড় হয়। তিতুনির নিশ্চয়ই সে রকম একটা স্টেজ যাচ্ছে–"

তিতুনি খুব সাবধানে বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দিল। এলিয়েন মেয়েটা রাক্ষসের মতো খেয়ে তাকে আরেকটু হলে বিপদে ফেলে দিত।

তিতুনির স্কুলটা বাসা থেকে বেশ দূরে, বড় সড়কটা ধরে হেঁটে হেঁটে সে স্কুলে যায়। এটা মোটেও ঢাকা শহরের মতো না, বড় সড়কটায় বাস, টেম্পো, ট্রাক কিছু নেই। একটা-দুইটা রিকশা যায়, মাঝে মাঝে একটা মোটরসাইকেল। যদি কখনো একটা গাড়ি যায় তাহলে সবাই মাথা ঘুরিয়ে দেখে কার গাড়ি কোথায় যাচ্ছে।

তিতুনি সড়কটা ধরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, একটু আগে বাসা থেকে বের হয়েছে, তাই সড়কটাতে স্কুলের ছেলে-মেয়ে বেশি নেই। একটু পরেই তাদের গার্লস স্কুলের মেয়ে আর সরকারি স্কুলের ছেলেদের দিয়ে সড়কটা ভরে যাবে। তিতুনি একটু অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে, সে এমন একটা ঝামেলার মাঝে পড়েছে, যার থেকে বের হবার কোনো রাস্তাই খোলা নেই। ছোটখাটো ঝামেলা হলে সে তার ক্লাশের বন্ধু রিতু কিংবা মাইশা কিংবা ঝিনুর সাথে কথা বলতে পারত, একটু বুদ্ধি-পরামর্শ নিতে পারত। কিন্তু এই সমস্যাটা এমনই জটিল যে কারো সাথে সেটা নিয়ে কথাও বলতে পারছে না। কাউকে বললে সে বিশ্বাসও করবে না। এলিয়েন মেয়েটি আজকে তার স্কুলের ড্রেস পরে বের হয়ে গেছে। এখন যদি স্কুলে এসে হাজির হয় তখন কী হবে? ব্যাপারটা চিন্তা করেই তার গায়ে কেমন জানি কাঁটা দিয়ে উঠল।

ঠিক তখন তিতুনির একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। সড়কের পাশে একটা ডোবার মতো আছে, সেই ডোবার পাশে একটা বড় গাছ, গাছটা ডোবার দিকে হেলে পড়েছে। একটা বড় ডাল ডোবার মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়েছে, সেই ডালটা থেকে আরো ডাল এমনভাবে বের হয়েছে যে দেখে মনে হয় কেউ একজন খুব আরাম করে সেখানে হেলান দিয়ে বসতে পারবে। শুধু তা-ই না, সেখানে বসে ডালটাকে দুলিয়ে দিলে মনে হয় সেটা দোলনার মতো দুলতে থাকবে। তিতুনি যখনই সড়কের কাছে এই ডোবা আর এই গাছটার পাশে দিয়ে গেছে তখনই সে মনে মনে ভেবেছে, একদিন আমি ডালে বসে বসে দোল খাব। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনোদিনও তার এই ডালে উঠে দোল খাওয়া হয়নি। আজকে তিতুনি দেখল ডোবার ওপর হেলে পড়া গাছের ডালটাতে হেলান দিয়ে একটা মেয়ে বসে আছে, মেয়েটা তাদের স্কুলের ড্রেস পরে আছে, শুধু তা-ই না, তিতুনি যেভাবে ভেবেছিল ঠিক সেইভাবে গাছের ডালটাকে দোল দিচ্ছে।

এক মুহূর্ত পরে তিতুনি বুঝতে পারল গাছের ডালটাতে যে বসে আছে সে অন্য-তিতুনি! সে এত দিন ধরে যে কাজটা করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল কিন্তু কোনোদিন করতে পারেনি আজকে এই মেয়েটা সেই কাজটাই করে ফেলছে। তিতুনি প্রথমে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল কেউ তাদের দেখছে কি না, তারপর গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, "এই মেয়ে।"

মেয়েটা তার দিকে না তাকিয়ে উত্তর দিল, "আমার নাম তিতুনি।"

তিতুনি হিংস্র গলায় বলল, "ঠিক আছে। এই তিতুনি।"

মেয়েটা ঘুরে তিতুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হলো?"

"তুমি এখানে কী করছ?"

"গাছে দোল খাচ্ছি।"

"কেন?"

"তার কারণ হচ্ছ তুমি। তুমি সব সময় এই গাছে উঠে দোল খেতে চেয়েছ কিন্তু খাও নাই। আমার এত সময় নাই, যা করার করে ফেলতে হবে। তাই আজকেই দোল খাচ্ছি।"

"যদি কেউ দেখে ফেলে?"

"দেখলে দেখবে।"

তিতুনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি আসলে কী চাও, আমাকে বলবে?"

মেয়েটা কিছুক্ষণ গাছের ডালে বসে তিতুনির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর গাছ থেকে নেমে আসতে শুরু করল। তিতুনি ভয়ে ভয়ে এদিক-সেদিক তাকিয়ে থাকে, তার পরিচিত কেউ যদি এখন হঠাৎ করে চলে আসে তখন কী হবে?

মেয়েটা নিচে নেমে এসে বলল, "চলো।"

"কোথায়?"

"স্কুলে।"

তিতুনি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "স্কুলে?"

"হ্যাঁ।"

"দুইজন একসাথে?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, "না, ঠিক একসাথে না, একটু আগে-পরে। তাহলে ঝামেলা কম হবে।"

"ঝামেলা কম হবে?" তিতুনি গরম হয়ে বলল, "একটা ক্লাশে দুইজন তিতুনি আর সেটা ঝামেলা কম?"

মেয়েটা ভালো মানুষের মতো হাসল, বলল, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি স্কুলের কেউ আমাদের দুইজনকে একসাথে দেখবে না। হয় তোমাকে দেখবে না হয় আমাকে দেখবে। কখনোই বুঝবে না আমরা দুইজন আলাদা মানুষ।"

"সেটা কেমন করে হবে?"

মেয়েটা বলল, "সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও।"

"তোমার উপর ছেড়ে দিলে কী হয় সেটা আমার খুব ভালো জানা আছে। টোটন আমাদের দুইজনকে একসাথে দেখার পর কি ঝামেলা হয়েছিল মনে আছে?"

মেয়েটা বলল, "মনে আছে। আর সেটা আমার জন্যে হয় নাই, সেটা হয়েছে তোমার মাতবরির জন্যে।"

তিতুনি চোখ পাকিয়ে বলল, "আমার মাতবরি? আমি কী মাতবরি করেছিলাম?"

"পুরো একটা নাটক করলে–আমাকে ফ্যানের উপর বসে থাকতে হলো।"

"তাহলে আমার কী করা উচিত ছিল?"

"আমার উপরে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

"তাহলে তুমি কী করতে?"

"আমি টোটনের মাথার ভেতরে ঢুকে তার নিউরন থেকে দুইজনকে একসাথে দেখার দৃশ্যটা মুছে দিতাম।"

তিতুনি মুখ হাঁ করে বলল, "তুমি কী করতে?"

"বললাম তো, যেসব নিউরনে দৃশ্যটা আছে সেটা মুছে দিতাম। দুইজনকে একসাথে দেখার কোনো স্মৃতি থাকত না। কেস কমপ্লিট।"

তিতুনি মুখ হাঁ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করতে?"

মেয়েটা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "এক কথা কয়বার বলব?"

তিতুনি রীতিমতো কষ্ট করে তার হাঁ হয়ে থাকা মুখটা বন্ধ করে বলল, "তুমি যখন ইচ্ছা যার মাথার ভেতরে ঢুকে যা খুশি তাই করতে পারো?"

মেয়েটা কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল, যেন এটা এমন কোনো ব্যাপারই না। তিতুনি আবার জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে?"

মেয়েটা কেমন যেন হতাশভাবে মাথা নাড়ল, বলল, "তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ আমি তোমার মতো দেখতে হলেও তোমার মতো বোকাসোকা, সাদাসিধে মানুষ না। আমি অনেক দূর গ্যালাক্সি থেকে এসেছি; অনেক উন্নত, অনেক বুদ্ধিমান একটা প্রাণী–যার ক্ষমতা তুমি কিংবা তোমাদের মানুষের চৌদ্দ গুষ্টি কল্পনা করতে পারবে না–"

তিতুনি মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি যে মহাকাশের যত বড় লাট সাহেবই হও না কেন, তুমি কিন্তু খুবই খারাপ ভাষায় কথা বলছ।"

"সেটা আমার দোষ না, সেটা তোমার দোষ। তোমার সাথে কথা বলার জন্য আমি তোমার ব্রেন ব্যবহার করছি, তুমি যেভাবে কথা

বলো আমি সেভাবে কথা বলছি। এইগুলি আমার কথা না, এইগুলি তোমার কথা, তুমি নিজে ভদ্রভাবে কথা বলা প্র্যাকটিস করে তারপর আমাকে উপদেশ দিও।"

তিতুনি বকুনিটা হজম করে বলল, "তোমরা কীভাবে কথা বলো?"

"আমরা কথা বলি না।"

"কথা বলো না? একজনের সামনে আরেকজন মুখ ভোঁতা করে বসে থাকো?"

মেয়েটা ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, "আমাদের মুখ নাই, তাই মুখ ভোঁতা করার উপায় নাই।"

"মুখ নাই?" তিতুনি রীতিমতো চিৎকার করে বলল, "তাহলে খাও কোন দিক দিয়ে?"

মেয়েটা বলল, "তোমাকে এগুলো বোঝাতে সময় লাগবে। তুমি ধরেই নিয়েছ মহাজাগতিক প্রাণীদেরও তোমাদের মতো হাত, পা, মুখ থাকতে হবে, খেতে হবে, কথা বলতে হবে। সেটা সত্যি নয়। হাত, পা, মুখ ছাড়াও প্রাণী হওয়া সম্ভব। তোমাদের সাথে মহাজাগতিক প্রাণীর শুধু একটা জায়গায় মিল আছে।"

"সেটা কী?"

"তোমরা নূতন জিনিস জানতে চাও। আমরাও চাই।"

তিতুনি মুখ শক্ত করে বলল, "সরি।"

মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, "সরি?"

"হ্যাঁ, আমার নূতন জিনিস জানার কোনো ইচ্ছা নাই। কেন আমার এলজেবরা শিখতে হবে? বাংলা ব্যাকরণ শিখতে হবে? তেলাপোকা কীভাবে খাবার হজম করে জেনে আমার কী লাভ?"

মেয়েটা আবার হেসে ফেলল, বলল, "আমি জানি। কিন্তু তোমাদের পৃথিবীর বোকাসোকা মানুষেরা যে এ পর্যন্ত টিকে আছে তার কারণ হচ্ছে মানুষ সব সময় নূতন জিনিস জানতে চায়।"

"আমি চাই না।"

"চাও। তাই একটু পরে পরে আমার কাছে আমাদের সম্পর্কে জানতে চাইছ। আমরা কীভাবে কথা বলি। কীভাবে খাই।"

তিতুনি মুখ শক্ত করে বলল, "সেটা অন্য কথা।"

"অন্য কথা না, একই কথা।"

হঠাৎ করে তিতুনি কেমন যেন আতঙ্কে জমে গেল, বলল, "সর্বনাশ!"

"কী হয়েছে?"

"মাহতাব চাচা।"

মেয়েটা সামনে তাকাল, দেখল আব্বুর দূর সম্পর্কের ভাই মাহতাব চাচা বগলে একটা ছাতা আর হাতে একটা বাজারের ব্যাগ নিয়ে সড়ক ধরে আসছেন। তিতুনি শুকনো গলায় বলল, "এখন কী হবে?"

মেয়েটা বলল, "আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি যা বলব তুমি ঠিক তাই করবে।"

"ঠিক আছে।"

দুজনে হেঁটে যেতে লাগল, মাহতাব চাচা আরেকটু কাছে আসার পর হঠাৎ মেয়েটা বলল, "এখন।"

"এখন কী?"

"তুমি নিচু হয়ে ভান করো তোমার জুতার ফিতে খুলে গেছে, সেটা বাঁধার চেষ্টা করো। মাথাটা নিচু করে রেখো যেন তোমার চেহারা দেখতে না পায়।"

তিতুনি মাথা নিচু করে জুতার ফিতা বাঁধার ভান করতে লাগল আর মাহতাব চাচা কাছে এসে দাঁড়ালেন। মেয়েটা বলল, "স্লামালেকুম চাচা।"

"ওয়ালাইকুম সালাম তিতুনি। স্কুলে যাচ্ছিস?"

"জি চাচা।"

"স্কুলে লেখাপড়া হয়?"

মেয়েটা তিতুনির মতো হি হি করে হাসল। বলল, "মাঝে মাঝে।"

"আজকালকার লেখাপড়ার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না। তোর বাবা ভালো আছে?"

"আছে।"

"মা? টোটন?"

"আছে। সবাই ভালো আছে।"

"ঠিক আছে। স্কুলে যা।" বলে মাহতাব চাচা তাদেরকে পিছনে ফেলে হেঁটে গেলেন।

তিতুনি তখন উঠে দাঁড়াল। মেয়েটা রাজ্য জয় করার ভঙ্গি করে তিতুনিকে বলল, "দেখলে, কোনো সমস্যা হয়েছে?"

তিতুনি চাপা গলায় বলল, "মাহতাব চাচা আমার চেহারা দেখেন নাই সে জন্যে সমস্যা হয় নাই। এখানে তোমার কোনো ক্রেডিট নাই।"

"দেখলেও কোনো সমস্যা ছিল না–"মেয়েটার কথা প্রমাণ করার জন্যেই কি না কে জানে হঠাৎ করে পিছন থেকে মাহতাব চাচা ডাকলেন, "এই তিতুনি। একটু দাঁড়া!"

তিতুনি এবং তিতুনির মতো দেখতে এলিয়েন মেয়ে দুজনেই দাঁড়াল। তিতুনি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "এখন? এখন কী করব?"

মেয়েটা বলল, "কিছুই করতে হবে না।"

মাহতাব চাচা লম্বা পা ফেলে এসে তিতুনিকে বললেন, "একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। তোর বাবাকে বলিস–"

মাহতাব চাচা হঠাৎ করে থেমে গেলেন, তিতুনির পাশে দাঁড়ানো মেয়েটি তার চোখে পড়েছে আর কেমন যেন ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো তার সারা শরীর কেঁপে উঠল। আমতা আমতা করে বললেন, "এ-এ-এইটা কে?"

"কোনটা?" প্রশ্নটা খুবই বোকার মতো হয়ে গেল কিন্তু তিতুনি আর কী করবে বুঝতে পারল না।

মাহতাব চাচা তোতলাতে তোতলাতে বললেন, "দু-দু-দু-দুইটা তিতুনি?"

তিতুনি মাথা নাড়ল, "জি চাচা। দুইটা।"

"দুইটা কেমন করে হয়?" মাহতাব চাচার মুখটা কেমন যেন হাঁ হয়ে গেল। মাছের মতো কেমন যেন খাবি খেলেন।

তিতুনি মাথা চুলকে বলল, "আমিও ঠিক জানি না চাচা।"

মাহতাব চাচা হঠাৎ কেমন যেন মাথা ঘুরে পড়ে যেতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তিতুনি খপ করে মাহতাব চাচার হাতটা ধরে ফেলল, ডাকল, "মাহতাব চাচা।"

মাহতাব চাচা কোনো উত্তর না দিয়ে কেমন যেন ঘোলা চোখে তিতুনির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিতুনির মতো দেখতে এলিয়েন মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, "আমি সরে যাই। স্মৃতি মুছে দিয়েছি–"

মেয়েটি ঘুরে জোরে জোরে পা ফেলে স্কুলের দিকে যেতে শুরু করল আর মাহতাব চাচা হঠাৎ কেমন করে জানি জেগে উঠলেন, তিতুনির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তিতুনি? স্কুলে যাচ্ছিস?" বোঝাই যাচ্ছে তার আগের কথা কিছু মনে নাই।

তিতুনি শুকনো মুখে বলল, "জি চাচা।"

"স্কুলে লেখাপড়া হয়?"

তিতুনি একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "মাঝে মাঝে।"

মাহতাব চাচা মাথা নেড়ে বললেন, "আজকালকার লেখাপড়ার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না।"

তিতুনি মাথা নাড়ল, "আমিও বুঝি না।"

"তোর বাবা ভালো আছে?"

"আছে।"

"মা? টোটন?"

"আছে। সবাই ভালো আছে।"

তিতুনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মাহতাব চাচা আব্বুকে কিছু একটা বলার জন্য ফিরে এসেছিলেন, সেটা শুনে নেয়া যাক। মাহতাব চাচা অবশ্যি কিছু বললেন না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তিতুনি জিজ্ঞেস করল, "মাহতাব চাচা, আব্বুকে কিছু একটা বলতে হবে?"

মাহতাব চাচা মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ। তোর বাবাকে বলবি–", বলে মাহতাব চাচা দাঁড়িয়ে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ চেষ্টা করলেন কিন্তু মনে করতে পারলেন না। মেয়েটা মাহতাব চাচার স্মৃতি থেকে ওই কথাটাও মুছে দিয়েছে।

মাহতাব চাচা কেমন যেন বোকার মতো একটু হেসে বললেন, "কী আশ্চর্য। মনে করতে পারছি না।" তারপর তিতুনির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু তুই কেমন করে বুঝতে পারলি তোর বাবাকে একটা কথা বলতে চাইছি?"

তিতুনি কাঁধ ঝাঁকাল, বলল, "জানি না। কেন জানি মনে হলো।"

মাহতাব চাচা কথাটা শুনে খুব অবাক হলেন বলে মনে হলো না। হেঁটে হেঁটে চলে গেলেন। তিতুনিও একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে স্কুলের দিকে হাঁটতে লাগল। সে সামনে তাকাল, তিতুনির মতো দেখতে এলিয়েন মেয়েটি হনহন করে স্কুলের দিকে যাচ্ছে। মেয়েটা আসলেই একজনের মাথার ভেতরে ঢুকে তার স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে। কী আশ্চর্য। মুছতে যখন পারে তাহলে কি উল্টোটা সম্ভব? কারো মস্তিষ্কে কি স্মৃতি লিখে দিতে পারবে? এলজেবরা কিংবা বাংলা ব্যাকরণ কিংবা তেলাপোকার পাচক প্রণালি কি মেয়েটা তার মগজে লিখে দিতে পারবে? তাহলে তাকে আর কষ্ট করে লেখাপড়া করতে হবে না।

৬

স্কুলে গিয়ে তিতুনি ক্লাশে তার ব্যাগটা রেখে বের হয়ে এলো। সাধারণত সে সামনের দিকে বসে। কী ভেবে সে আজকে সবচেয়ে পিছনে তার স্কুলের ব্যাগ রাখল। স্কুলে এখনো সব মেয়েরা আসেনি–তিতুনি চোখের কোনা দিয়ে অন্য-তিতুনিকে খুঁজতে থাকে। তাদের দুইজনকে একসাথে কেউ দেখে ফেলবে আর তখন সেটা নিয়ে মহা কেলেঙ্কারি শুরু হয়ে যাবে, সেটা নিয়ে এখন আর তার ভেতরে কোনোরকম আতঙ্ক নাই।

তিতুনি স্কুলের বারান্দায় এসে ডানে-বাঁয়ে তাকাল তখন দেখল বারান্দার অন্য মাথা থেকে অন্য-তিতুনি হনহন করে হেঁটে আসছে। মুখটা খুবই গম্ভীর।

তিতুনি দাঁড়িয়ে রইল আর অন্য-তিতুনি কাছাকাছি এসে নিচু গলায় বলল, "সর্বনাশ হয়েছে।"

"কী সর্বনাশ?"

মেয়েটা ডানে-বামে তাকিয়ে বলল, "এখানে বলা যাবে না।"

"কোথায় বলবে?"

"লাইব্রেরিতে যাও। আমিও যাচ্ছি।"

তিতুনি মাথা নাড়ল, লাইব্রেরিটাই ভালো জায়গা। তাদের স্কুলে কীভাবে কীভাবে জানি একটা বেশ সুন্দর আর বড় লাইব্রেরি আছে, সেই লাইব্রেরিটা ফাঁকাই থাকে, পিছনে বসে নিরিবিলি কথা বলা যাবে। তিতুনি হেঁটে হেঁটে লাইব্রেরিতে গিয়ে পিছনের দিকে একটা বইয়ের আলমারির পিছনে বসে পড়ল। কী সর্বনাশ হয়েছে সেটা চিন্তা করে তার বুকটা ধুকপুক করছে।

কিছুক্ষণের মাঝেই অন্য-তিতুনি এসে তার সামনে বসে এদিক-সেদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "মাহতাব চাচার স্মৃতি মুছে দিয়েছি মনে আছে?"

"হ্যাঁ। মাহতাব চাচার কিছু মনে নাই।" তিতুনি তখনো বুঝতে পারল না ঠিক কোন ব্যাপারটা সর্বনাশ।

"মাহতাব চাচা আব্বুকে একট জিনিস বলতে চেয়েছিলেন মনে আছে?"

"হ্যাঁ।" তিতুনি মাথা নাড়ল, "মাহতাব চাচা সেটা মনে করতে পারে নাই। সেটাও ভুলে গেছে।"

তিতুনির মতো দেখতে মেয়েটা মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমি যখন স্মৃতি মুছে দিচ্ছিলাম তখন সেটা মুছে গেছে।"

তিতুনি মাথা নাড়ল, বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছিল।"

"কত বড় সর্বনাশ।"

তিতুনি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কোন জিনিসটা সর্বনাশ?"

"এই যে আমি অন্য একটা স্মৃতি মুছে দিলাম–"

"সর্বনাশের কী আছে? আমরা সব সময় এইটা-সেইটা ভুলে যাই। সবকিছু মনে রাখলে উপায় আছে?"

মেয়েটা কঠিন মুখ করে বলল, "তোমরা ভুলে যাও সেটা তোমাদের ব্যাপার, কিন্তু আমাদের একটা নিয়ম মানতে হয়।"

"নিয়ম?"

"হ্যাঁ। খুবই কঠিন একটা নিয়ম। আমরা যখন কোনো গ্রহে যাই সেই গ্রহটাতে যদি কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে তাহলে সেই গ্রহের কোনো কিছু আমরা পরিবর্তন করি না। কিন্তু আমি পরিবর্তন করে ফেলেছি। যেটুকু মোছা দরকার তার থেকে বেশি মুছে ফেলেছি। আমরা যে সেই গ্রহে গিয়েছি সেটা গ্রহের একটা প্রাণীও জানতে পারে না যে আমরা এসেছি।"

"আমি যে জানলাম?"

"সেটা সাময়িক।"

"সাময়িক মানে?"

মেয়েটা বলল, "সাময়িক মানে হচ্ছে আমি যাবার সময় তোমার সব স্মৃতি মুছে দিয়ে যাব।"

তিতুনি চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললে?"

"কী বলেছি তুমি শুনেছ।"

তিতুনি হিংস্র চোখে বলল, "তুমি খালি চেষ্টা করে দেখো। আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।"

তিতুনি খুন করে ফেলবে শুনেও মেয়েটা খুব ঘাবড়ে গেল মনে হলো না, বলল, "সেটা পরে দেখা যাবে। কিন্তু এখন কী করি বলো দেখি? আমি যে মাহতাব চাচার নিজস্ব কিছু স্মৃতি মুছে ফেললাম। এত বড় একটা নিয়ম ভেঙে ফেললাম–"

তিতুনি বলল, "তোমার নিয়মের খেতা পুড়ি। আমার উল্টো একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। ফাটাফাটি মারামারি কাটাকাটি আইডিয়া।"

"কী আইডিয়া? অন্য-তিতুনি বলল, "আমি ইচ্ছে করলে তোমার মাথায় ঢুকে দেখতে পারি।"

তিতুনি চোখ পাকিয়ে বলল, "খবরদার, তুমি আমার মাথায় ঢুকবে না। খবরদার।"

"তাহলে বলো।"

"আজকে ফার্স্ট পিরিয়ড ফাক্কু স্যারের ক্লাশ। ফাক্কু মানে হচ্ছে ফখরুল–"

"জানি।"

"ফাক্কু স্যার হোম ওয়ার্ক দিয়েছে। আজকে জমা দেওয়ার কথা।"

"জানি।"

"আমি হোম ওয়ার্ক করি নাই। করতে ভুলে গেছি, তুমি এসে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে–"

"জানি।"

"হোম ওয়ার্ক না আনলে ফাক্কু স্যার মারে।"

"জানি।"

"খপ করে চুলটা ধরে ফেলে। এমনি করে ঝাঁকুনি দেয়।" তিতুনি হাত দিয়ে দেখাল। "গত মাসে ফারিয়ার চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বেঞ্চে মেরেছে, নাকটা বোঁচা হয়ে গেছে।"

"জানি।"

"ফারিয়ার নাকটা অবশ্যি আগে থেকেই একটু বোঁচা।"

"জানি।"

"তাই আমি বলছিলাম ফাক্কু স্যারের ক্লাশে গিয়ে তুমি তার মাথার মাঝে ঢুকবে। ঢুকে সে যে হোম ওয়ার্ক দিয়েছে সেটা ভুলিয়ে দেবে।"

অন্য-তিতুনি মুখটা শক্ত করে বলল, "অসম্ভব।"

"অসম্ভব?"

"হ্যাঁ। তোমাদের পৃথিবীর কোনো কিছু আমাদের পরিবর্তন করার কথা না।"

তিতুনি গরম হয়ে বলল, "এই রকম বড় বড় বোলচাল করা বন্ধ করো। আমাদের পৃথিবীতে এসেছ, পৃথিবীর নিয়ম মেনে চলো।"

"পৃথিবীর নিয়ম?"

"হ্যাঁ। পৃথিবীর নিয়ম হচ্ছে বদমানুষকে সাইজ করা। ফাক্কু স্যার হচ্ছে বদ নাম্বার ওয়ান। কাজেই তাকে সাইজ করা দরকার।"

অন্য-তিতুনি মুখটা আরো শক্ত করে বলল, "অসম্ভব।"

"তুমি করবে না? শুধুমাত্র ছোট একটা জিনিস তাকে ভুলিয়ে দেবে না?"

"না।"

তিতুনির এমন রাগ উঠল সেটা আর বলার মতো না। কিন্তু রাগ করে তো আর লাভ নেই, তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক আছে, তুমি তাহলে ফাক্কু স্যারের ক্লাশে যাও। আমি যাচ্ছি না।"

"তুমি কী করবে?"

"আমি এইখানে বসে থাকব।"

অন্য-তিতুনি রাজি হয়ে গেল, বলল, "ঠিক আছে।"

"যখন দেখবে তুমি হোম ওয়ার্ক আনো নাই তখন তোমার চুলগুলি খপ করে ধরে যখন ডেস্কের মাঝে তোমার নাকটা থেঁতলে দিবে তখন আমার কাছে নালিশ করতে এসো না।"

অন্য-তিতুনি কোনো কথা বলল না, তিতুনি বলল, "আমি ক্লাশে সবার পিছনে বসেছি। আমার ব্যাগটা খুঁজে বের করতে পারবে তো?"

অন্য-তিতুনি মাথা নাড়ল। জানাল, সে পারবে।

ফাক্কু স্যারের ক্লাশটা ঠিক যেভাবে শুরু হওয়ার কথা সেইভাবে শুরু হলো। ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে ফাক্কু স্যার ক্লাশে ঢুকলেন। হাতে চক, ডাস্টারের সাথে সাথে রেজিস্টার খাতা, বই, কলম আর একটা রুলার। যে কেউ মনে করতে পারে ক্লাশে পড়ানোর জন্যে একজন স্যার এগুলো তো আনতেই পারে, আসলে ব্যাপারটা মোটেই সে রকম না। এর সবগুলি হচ্ছে ক্লাশের মেয়েদের শাস্তি দেওয়ার অস্ত্র। আগে বেত নিয়ে ক্লাশে আসতেন, গভর্নমেন্ট বেত মারা বেআইনি করে দেবার পর প্রথম প্রথম ফাক্কু স্যারের খুব মন খারাপ ছিল, তারপর আস্তে আস্তে শাস্তি দেওয়ার এই অস্ত্রগুলো আবিষ্কার করেছেন। যেমন চক কিংবা কলম দুই আঙুলের মাঝখানে রেখে আঙুল দুটো চেপে ধরা ফাক্কু স্যারের খুবই প্রিয় শাস্তি। বই আর রেজিস্টার খাতা দিয়ে দড়াম করে মাথার মাঝে মারা তার আরেকটা প্রিয় শাস্তি। দূর থেকে কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে ডাস্টারটা ক্রিকেট বলের মতো ছুড়ে মারেন। পুরানো দিনের মতো বেত মারার ইচ্ছা করলে স্টিলের রুলারটা দিয়ে হাতের মাঝে মারেন। ফাক্কু স্যারের সবচেয়ে প্রিয় শাস্তি হচ্ছে খপ করে চুলগুলো ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ডেস্কের সাথে মাথাটা ঠুকে দেওয়া। স্যারকে প্রমোশন দিয়ে ছেলেদের স্কুলে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, স্যার রাজি হননি। তার আসল কারণ হচ্ছে ছেলেদের মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা থাকে বলে খপ করে ধরা যায় না। মেয়েদের চুল এভাবে ধরা সোজা।

ক্লাশে ঢুকেই স্যার সবাইকে একনজর দেখে মুখে একটু লোল টানলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোরা সবাই হোম ওয়ার্ক এনেছিস?"

ক্লাশের প্রায় সবাই মাথা নাড়ল, কেউ মুখে কোনো কথা বলল না। যারা হোম ওয়ার্ক আনেনি শুধু তাদের চেহারা কেমন যেন রক্তশূন্য হয়ে গেল। ফাক্কু স্যার কেমন যেন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কারা কারা হোম ওয়ার্ক আনিসনি?"

পাঁচজন খুব ধীরে ধীরে হাত তুলল। তাদের চেহারা দেখে মনে হলো তাদের শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই। ফাক্কু স্যার মুখে একটা হিংস্র হাসি ফুটিয়ে কাছাকাছি মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেলেন, নাগালের মাঝে চলে আসতেই খপ করে মেয়েটার চুল ধরে ফেললেন, মেয়েটা একটা আর্তচিৎকার করল। ফাক্কু স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কেন হোম ওয়ার্ক আনিসনি?"

"শরীর খারাপ ছিল স্যার। জ্বর আর মাথাব্যথা।"

ফাক্কু স্যার চুল ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "মাথাটা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলি? তাহলে তো আর মাথাব্যথা থাকবে না!"

মনে হলো মেয়েটা সত্যি সত্যি ভাবল ফাক্কু স্যার তার মাথাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলবেন। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "না স্যার। না স্যার! প্লিজ স্যার। প্লিজ স্যার।"

ফাক্কু স্যার বড় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পরের মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেলেন। মুখে লোল টেনে বললেন, "তুই কেন হোম ওয়ার্ক করিসনি?"

"করেছি স্যার, খাতাটা আনতে ভুলে গেছি।"

ফাক্কু স্যার খপ করে মেয়েটার চুল ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "শুধু যে হোম ওয়ার্ক আনিসনি তা না, আবার আমার সাথে মিথ্যা কথা?"

মেয়েটা প্রায় হাহাকারের মতো শব্দ করে বলল, "না স্যার, সত্যি স্যার। সত্যি হোম ওয়ার্ক করেছি স্যার।"

ফাক্কু স্যার গর্জন করে বললেন, "আবার মিথ্যা কথা?" তারপর চুলের মুঠি ধরে মেয়েটার মাথাটা প্রচণ্ড জোরে ডেস্কে মেরে বসলেন। খটাস করে এত জোরে শব্দ হলো যে মনে হলো মেয়েটার মাথাটা বুঝি দুই টুকরো হয়ে ভেতরের মগজ বের হয়ে এসেছে।

ক্লাশের সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল আর ফাক্কু স্যার তখন তিন নম্বর মেয়েটার কাছে এগিয়ে গেলেন। এতক্ষণে এই মেয়েটি বুঝে গেছে যে শুধু শুধু কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে লাভ নেই, তাতে শাস্তিটা বরং আরো বেশি হতে পারে, তাই সে একেবারে সরাসরি স্যারেন্ডার করে বলল, "ভুল হয়ে গেছে স্যার। আর কখনো ভুল হবে না।"

ফাক্কু স্যার তার চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে টেনে মেঝে থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে তুলে নিয়ে বললেন, "ভুল? আর যদি ভুল হয় তাহলে তোর মাথার সব চুল ছিঁড়ে ফেলব।"

মেয়েটা কোনোমতে বলল, "আর ভুল হবে না স্যার।"

চতুর্থ মেয়েটির কাছে যাবার আগেই মেয়েটি ফ্যাসফ্যাস করে কাঁদতে শুরু করেছে। ফাক্কু স্যার তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, "মাফ করে দেন স্যার। মাফ করে দেন।"

"কী জন্যে মাফ করব? চুরি করেছিস নাকি কারো পকেট মেরেছিস?"

"না স্যার।" মেয়েটা ফ্যাসফ্যাস করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হোম ওয়ার্ক আনি নাই স্যার।"

ফাক্কু স্যার খুবই অবাক হয়েছেন সে রকম ভান করে বললেন, "কী আশ্চর্য। হোম ওয়ার্ক আনিস নাই বলে এত কান্না!" তারপর খপ করে মেয়েটার চুল ধরে হঠাৎ করে মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "কান্না বন্ধ করবি কি না বল। না হলে চোখ দুটো খাবলে বের করে নিব।"

ভয়ে মেয়েটার কান্না বন্ধ হয়ে গেল, শুধু হেঁচকি উঠতে লাগল। ফাক্কু স্যার চুল ধরে মাথাটা ডানে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে এক পাক ঘুরিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিলেন, আর সে একেবারে পিছনে

হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সেটা দেখে ফাক্কু স্যার খুবই তৃপ্তির একটা শব্দ করে বললেন, "আর কে যেন হোম ওয়ার্ক আনে নাই।"

একেবারে পিছনে বসে থাকা তিতুনির মতো দেখতে এলিয়েন মেয়েটি হাত তুলে বলল, "আমি স্যার।"

গলার স্বরে ভয়-ভীতি-আতঙ্ক কিছু নেই। ফাক্কু স্যর খুব অবাক হয়ে অন্য-তিতুনির দিকে তাকালেন, বললেন, "তুই হোম ওয়ার্ক আনিসনি?"

"না স্যার।" এবারেও গলার স্বর বেশ স্বাভাবিক, প্রায় হাসি-খুশি বলা যায়।

ফাক্কু স্যারের মুখটা দেখতে দেখতে কেমন যেন হিংস্র হায়েনা কিংবা বেজির মতো হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত কষে বললেন, "কেন আনিসনি?"

অন্য-তিতুনি খুবই স্বাভাবিক গলায় বলল, "কেন আনিনি সেটার ইতিহাস খুবই জটিল। আপনাকে সেটা বললে আপনি বুঝবেন বলে মনে হয় না।"

মেয়েটার কথা শুনে ফাক্কু স্যার যত অবাক হলেন ক্লাশের মেয়েরা তার থেকে অনেক বেশি অবাক হয়ে তিতুনির দিকে তাকাল। বলে কী মেয়েটা! তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ফাক্কু স্যার নাক দিয়ে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ক্লাশের পিছনের দিকে এগুতে লাগলেন, মুখে বললেন, "তুই কী বললি? আমি বুঝব বলে মনে হয় না?"

অন্য-তিতুনি বলল, "না স্যার।"

"একবার বলেই দেখ আমি বুঝি কি না।"

"কোনো লাভ নাই স্যার। আমার মনে হয়–"

"কী মনে হয়?"

"অন্যদের যে রকম শাস্তি দিয়েছেন, আমাকেও দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলেন।"

ফাক্কু স্যার কেমন যে হাঁ হয়ে গেলেন। একবার খাবি খেয়ে বললেন, "ঝামেলা চুকিয়ে ফেলব?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, "জি স্যার।"

শিকার ধরার আগে বাঘ যে রকম এক পা এক পা করে গিয়ে যায় ফাক্কু স্যার ঠিক সে রকম এক পা এক পা করে তিতুনির মতো মেয়েটার দিকে এগিয়ে গিয়ে খপ করে তার চুলগুলো ধরলেন। তারপরে একটা ঝাঁকুনি দিতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন তার ঘাড়টা লোহার মতো শক্ত, ঝাঁকুনি দিয়ে এক বিন্দু নাড়াতে পারলেন না। ফাক্কু স্যার চুলগুলো ছেড়ে দিয়ে আবার খাবলা দিয়ে আরো ভালো করে চুলগুলো শক্ত করে ধরে আরো জোরে একটা ঝাঁকুনি দেয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু মেয়েটার মাথাটা এক বিন্দু নাড়াতে পারলেন না, মনে হলো ঘাড়টা বুঝি কংক্রিট দিয়ে তৈরি।

ফাক্কু স্যার আরো কয়েকবার ঝাঁকুনি দেওয়ার চেষ্টা করে চুলগুলো ছেড়ে দিয়ে ক্ষিপ্ত চোখে মেয়েটার দিকে তাকালেন। মেয়েটা হাসি হাসি মুখে বলল, "আমার শাস্তি শেষ স্যার?"

ফাক্কু স্যার বললেন, "তুই তুই তুই–"

ফাক্কু স্যারের কথা শেষ হবার জন্যে মেয়েটা অপেক্ষা করতে লাগল কিন্তু ফাক্কু স্যার কথা শেষ করতে পারলেন না। মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, "আর কিছু বলবেন স্যার?"

ফাক্কু স্যার হুংকার দিয়ে বললেন, "তোকে আজকে খুন করে ফেলব। পিটিয়ে তক্তা করে দেব। বেয়াদব মেয়ে, আমার সাথে টিটকারি?"

তারপর ফাক্কু স্যার পিটিয়ে তক্তা করার জন্যে ক্লাশের সামনে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে স্টিলের রুলারটা হাত নিলেন, তারপর সেটা ঘুরাতে ঘুরাতে স্টিম ইঞ্জিনের মতো ক্লাশের পিছনে অন্য-তিতুনির দিকে এগুতে লাগলেন।

ক্লাশের সব মেয়েরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে এই ভয়ংকর দৃশ্যটি দেখতে লাগল। ফাক্কু স্যার রুলারটা তরবারির মতো ঘুরাতে ঘুরাতে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন, তাকে দেখে মনে হলো কী করছেন, কোথায় যাচ্ছেন হঠাৎ করে ভুলে গেছেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন, দেখে মনে হতে লাগল

যন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে গেছেন। তারপর হঠাৎ করে যেন জেগে উঠলেন, জেগে উঠে হাতে ধরে রাখা স্টিলের রুলারটা অনিশ্চিতের মতো ঘুরাতে লাগলেন এবং এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলেন। দেখে বোঝা যাচ্ছে ফাক্কু স্যার কী করছেন নিজেই ভালো করে জানেন না।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে স্টিলের রুলারটা ঘুরাতেই থাকলেন, ঘুরাতেই থাকলেন। ঘুরাতে ঘুরাতে একসময় হঠাৎ করে তার সবকিছু মনে পড়ল, তখন আবার তিতুনির মতো দেখতে এলিয়েন মেয়েটির দিকে তাকালেন আর তার চোখ দুটি ধক করে জ্বলে উঠল। হিংস্র গলায় বললেন, "তোকে আমি খুন করে ফেলব।" তারপর নাক দিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তক অম খন কর ফলব।" বলেই কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন। কী বললেন স্যার?

ফাক্কু স্যার আবার বলার চেষ্টা করলেন, সবাই শুনল স্যার বললেন, "তক অম খন কর ফলব।" নিশ্চিতভাবেই বলার চেষ্টা করছেন তোকে আমি খুন করে ফেলব, কিন্তু বলছেন অন্যভাবে।

তিতুনির মতো মেয়েটাকে খুন করে ফেলার কাজটা আপাতত বন্ধ করে ফাক্কু স্যার ঠিক করে কথা বলার চেষ্টা করলেন, বিড়বিড় করে বললেন, "ক হল অমর? অম ঠক কর কথ বলত পরছ ন কন?"

ক্লাশের মেয়েদের ভেতর অবাক হওয়ার বিষয়টা শেষ হয়ে হঠাৎ করে একধরনের মজা পাওয়ার বিষয়টা শুরু হলো। কে যেন খুকখুক করে হেসে উঠল। হাসি ব্যাপারটা সংক্রামক এবং হঠাৎ করেই অনেকে খুকখুক করে হাসতে শুরু করল। ফাক্কু স্যার ক্লাসের দিকে তাকালেন এবং হুংকার দিয়ে বললেন, "খবরদর! চপ কর সবই।"

যদিও কথার উচ্চারণ বিচিত্র কিন্তু সবাই বুঝল, ফাক্কু স্যার সবাইকে চুপ করতে বলছেন, তাই আপাতত তারা হাসি থামিয়ে আর কী মজা হয় সেটা দেখার জন্যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। স্যার একবার ঢোঁক গিললেন, তারপর বিড়বিড় করে বললেন, "হল! হল! হল মক্রফন টস্টং। ওন ট থ্র ফর ফভ–"

মাইক টেস্ট করার সময় যেভাবে বলে, "হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং। ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ" ঠিক সেভাবেই ফাক্কু স্যার তার কথা বলার সিস্টেম টেস্ট করে দেখছেন। কাজ হচ্ছে না।

ফাক্কু স্যার ক্লাশের দিকে তাকালেন, ফ্যাকাসে মুখে বললেন, "ক হল অমর?"

অন্য-তিতুনি হাসি হাসি মুখে বলল, "স্যার, আপনি আকার-উকার-একার ব্যবহার না করে কথা বলার চেষ্টা করছেন।"

স্যার ফ্যাকাসে মুখে মাথা নাড়লেন। ক্লাশের ফার্স্ট গার্ল যে সবকিছু জানে সে বলল, "স্যার আপনার মনে হয় ব্রেন স্ট্রোক করেছে।"

ফাক্কু স্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, "ব্রন স্টর্ক?"

"জি স্যার। ব্রেন স্ট্রোক হয়ে ব্রেনের যে জায়গায় আকার-উকার-একার আছে সেটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। তাই আকার-উকার-একার বলতে পারছেন না।"

ফাক্কু স্যারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, স্যার বললেন, "তই কমন কর জনস?" কারো বুঝতে সমস্যা হলো না স্যার বলার চেষ্টা করছেন, "তুই কেমন করে জানিস?"

মেয়েটা উত্তর দেওয়ার আগেই অন্যেরা বলল, "ওর আব্বু ডাক্তার।"

ডাক্তারের মেয়ে নিশ্চয়ই অর্ধেক ডাক্তার হবে, তাই ফাক্কু স্যার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওখন ক হব?" অর্থাৎ "এখন কী হবে?"

ডাক্তারের মেয়ে মাথা চুলকাতে থাকে, এখন কী হবে সে জানে না। তখন অন্য-তিতুনি বলল, "স্যার, মনে হয় আপনাকে আবার নূতন করে শিখতে হবে।"

ফাক্কু স্যার মুখ কালো করে বললেন, "নতন কর শখত হব?"

"জি স্যার, প্রথমে আকার বলা প্র্যাকটিস করেন, তারপর ইকার, তারপর উকার এভাবে। আস্তে আস্তে শিখতে হবে।"

ফাক্কু স্যার একটু আগে স্টিলের রুলার দিয়ে পিটিয়ে অন্য-তিতুনিকে খুন করে ফেলতে চেয়েছিলেন। ঠিক করে কথা বলতে না পারায় এই ভয়াবহ বিপদে পড়ে এখন সেসব ভুলে গেছেন। যে যেই পরামর্শ দিবে সেটাই মেনে নিতে রাজি। অন্য-তিতুনির পরামর্শ খুব আগ্রহ নিয়ে শুনলেন।

অন্য-তিতুনি বলল, "জি স্যার, একটা কবিতা আবৃত্তি করার চেষ্টা করেন। 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' কবিতাটা আপনি জানেন স্যার?"

ফাক্কু স্যার মাথা নেড়ে জানালেন যে কবিতাটা জানেন। তিতুনি বলল, "তাহলে আপনি এখন প্রথমে এটাকে বলবেন এভাবে–

সকল উঠয় অম মন মন বল
সরদন যন অম ভল হয় চল।

তারপর এর সাথে আকার লাগিয়ে বলার চেষ্টা করবেন। তখন এটা হবে–

সাকালা আঠায়া আমা মানা মানা বালা
সারাদান যানা আমা ভালা হায়া চালা।

যখন আকার প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তখন ইকার লাগাবেন। তখন বলবেন–

সিকিলি ইঠিয়ি ইমি মিনি মিনি বিলি
সিরিদিন যিনি ইমি ভিলি হিয়ি চিলি।

যখন এইটা প্র্যাকটিস হবে তখন–"

ফাক্কু স্যার হাত তুলে অন্য-তিতুনিকে থামালেন, বললেন, "বঝছ। অম বঝছ।" অর্থাৎ "বুঝেছি। আমি বুঝেছি।"

একটু পরে দেখা গেল ফাক্কু স্যার চেয়ারে গুটিশুটি হয়ে বিড়বিড় করে কবিতা বলার চেষ্টা করছেন।

ক্লাশ শেষ হওয়ার আগে ক্লাশের বেশিরভাগ মেয়েই আকার-ইকার ছাড়া কথা বলতে এবং সেই কথা বুঝতে শিখে গেল।

স্কুল ছুটির পর আসল তিতুনি যখন বাসায় ফিরে যাচ্ছে তখন তাদের ক্লাশের একজন মেয়ে ঝিনু ছুটে এসে তাকে ধরে বলল, "ততন, ও ততন!"

তিতুনি অবাক হয়ে বলল, "কী বলছিস তুই?"

মেয়েটি হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "অম বলছ অজক ক মজ হল, তই ন?"

তিতুনি সাথে সাথে বুঝে গেল অন্য-তিতুনি ক্লাশে নিশ্চয়ই কোনো একটা অঘটন ঘটিয়েছে। কী অঘটন ঘটিয়েছে এখন জানার উপায় নেই কিন্তু যেটাই ঘটে থাকুক সেটা নিশ্চয়ই খুবই মজার। তা না হলে সবাই এই বিচিত্র ভাষায় কথা বলছে কেন?

মেয়েটা বলল, "ক হল? তই কথ বলস ন কন?"

তিতুনি বলল, "বলছ। অম কথ বলছ।"

তারপর দুইজনে মিলে হি হি করে হাসতে লাগল। শুধু তিতুনি তখনো জানে না সে কেন হাসছে।

৭

খাবার টেবিলে আব্বু বললেন, "কালকে সবাই মিলে ঢাকা যাব।" টোটন আনন্দের মতো শব্দ করল আর তিতুনি যন্ত্রণার মতো একটা শব্দ করল। ঢাকা শহর টোটনের খুবই পছন্দ, তার একটা কারণ ঢাকা গেলে তারা সাধারণত বড় ফুপুর বাসায় ওঠে আর বড় ফুপুর বড় ছেলে ঠিক টোটনের বয়সী। স্বভাবও ঠিক টোটনের মতো। বড় ফুপুর সব ছেলে-মেয়েগুলোই জানি কী রকম আঠা আঠা, কথা বলে না, হাসে না। যখন হাসে তখন মুখটা জানি কী রকম বাঁকা করে হাসে, দেখেই তিতুনির মেজাজ গরম হয়ে যায়। ঠিক কী কারণ কে জানে বড় ফুপুর সব ছেলে-মেয়ে মিলে সব সময় টোটনকে নিয়ে তিতুনির উপর চড়াও হয়। তাকে জ্বালাতন করে, টিটকারি মারে, তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তা ছাড়া ঢাকায় ফুপুর সেই অ্যাপার্টমেন্টে তিতুনির দম বন্ধ হয়ে আসে, চারিদিকে বিল্ডিং আর বিল্ডিং, কোথাও এতটুকু ফাঁকা জায়গা নেই। ফুপুর ছেলে-মেয়েরা কখনো অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয় না, সবার গায়ের রং ইটের নিচে চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মতো ফর্সা, সবাই গোলগাল, নাদুসনুদুস। সবাই চব্বিশ ঘণ্টা কম্পিউটারে গেম খেলে না হয় টিভি দেখে দেখে তাই সবার চোখে চশমা।

আব্বু বললেন, "অনেক দিন ঢাকা যাই না। একটু ঘুরে আসি। বুবুর সাথে একটা কাজও আছে।"

টোটন টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক। আমরা কেন এই জঙ্গলে পড়ে থাকি আব্বু? আমরা কেন বড় ফুপুর মতো ঢাকা থাকতে পারি না?"

আব্বু বললেন, "ঢাকা থাকা কী মুখের কথা নাকি? লিভিং কস্ট কত জানিস? সেখানে গেলে তোরা কোন স্কুলে পড়বি? কী করবি?"

তিতুনি বলল, "আমি ঢাকা যেতে চাই না।"

টোটন বলল, "তুই হচ্ছিস গেরাইম্যা মেয়ে। তুই কেন শহরে যেতে চাইবি?"

তিতুনি বলল, "আমি সেটা বলি নাই।"

"তাহলে কী বলেছিস?"

"আমি বলেছি আমি কালকে ঢাকা যেতে চাই না।"

আম্মু বললেন, "ঢাকা যেতে চাই না মানে?"

"আমার ঢাকা যেতে ভালো লাগে না। এত ভিড়, এত মানুষ–"

আব্বু বললেন, "তোর বড় ফুপু তোদের কত আদর করে।"

"বড় ফুপুকে বলো এখানে চলে আসতে।"

"সে কত ব্যস্ত, কীভাবে সময় পাবে?"

তিতুনি যদিও মুখে এই কথাগুলো বলছে কিন্তু তার মাথায় সারাক্ষণ এলিয়েন তিতুনির কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার পুরো জীবনটা এখন এলিয়েন তিতুনির হাতে। এত বড় একটা ব্যাপার অথচ ব্যাপারটা কাউকে জানাতে পারছে না–ঠিক কেন জানাতে পারছে না সেটাও বুঝতে পারে না। এলিয়েন তিতুনি যদি দেখতে অন্য রকম হতো তাহলে ব্যাপারটা কত সোজা হতো, কিন্তু শুধু যে দেখতে হুবহু এক তা-ই নয়, তার কথাবার্তা, চিন্তা-ভাবনা তার মতো, তার পুরো মগজটাও সে কপি করে নিজের মাথায় রেখেছে, সে যেটা জানে অন্য-তিতুনিও সেটা জানে। মাঝে মাঝে তার সন্দেহ হতে থাকে আসল তিতুনি কোনজন, সে নাকি অন্যজন!

কাজেই যখন ঢাকা যাওয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন তিতুনির মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে অন্য-তিতুনির কথা। সে এখন কী করবে? তাদের সাথে যাবে নাকি এখানে একা একা থেকে যাবে?

তিতুনি অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করছিল, তখন হঠাৎ শুনল আব্বু বলছেন, "খুব ভোরে রওনা দিব। একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছি। চারজন একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে যেতে পারব।"

টোটন বলল, "ফ্যান্টাস্টিক।"

তিতুনি বলল, "আমি যেতে চাই না।"

আম্মু একটু গরম হয়ে বললেন, "বাসায় তুই একা একা থাকবি নাকি?"

তিতুনির ইচ্ছে হলো বলে, "আমি মোটেও একা থাকব না। আমার সাথে থাকবে একটা এলিয়েন। তোমরা আমাকে যতটুকু দেখে-শুনে রাখবে এই এলিয়েন আমাকে তার থেকে একশ' গুণ বেশি দেখে-শুনে রাখবে। ফাক্কু স্যারের মতো মানুষকে সে সাইজ করে ছেড়ে দিয়েছে।" কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর সেটা বলতে পারে না, তাই চুপ করে রইল।

আম্মু বললেন, "খাওয়ার পর ছোট একটা ব্যাগে দুই দিনের জামা-কাপড় গুছিয়ে নিস। সকালে যেন দেরি না হয়।"

তিতুনি কোনো কথা বলল না, একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল। আজকে স্কুল থেকে ফেরার পর অন্য-তিতুনির সাথে তার দেখা হয়নি। কোথায় আছে কে জানে। আজকে কোন কায়দায় বাসায় ঢুকবে, ঢুকে আবার কোন ঝামেলা পাকাবে সেটাই বা কে জানে! স্কুলে ফাক্কু স্যারকে সাইজ করার জন্য ক্লাশে সে একটা বড় কিছু অঘটন ঘটিয়েছে টের পেয়েছে, অঘটনটা ঠিক কী সেটাও তিতুনি জানে না। না জানা পর্যন্ত সে খুব অস্বস্তিতে আছে, কারণ ক্লাশের সবাই ধরেই নিয়েছে ঘটনাটা ঘটিয়েছে সে।

তিতুনি চুপচাপ খেয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে চমকে উঠল। বিছানায় লম্বা হয়ে অন্য-তিতুনি শুয়ে আছে। তিতুনি চমকে উঠে ফিসফিস করে বলল, "তুমি?"

অন্য-তিতুনি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আমি।"

"কেমন করে ঢুকেছ?"

অন্য-তিতুনি বলল, "জানালা দিয়ে।"

"জা-জানালা দিয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"দোতলার জানালায় উঠেছ কেমন করে?"

"হ্যাঁচড়-প্যাঁচড় করে, খামচা-খামচি করে।"

"জানালার শিকের ভেতর দিয়ে ঘরে ঢুকেছ কেমন করে?"

"শিক বাঁকা করে নিয়েছি।"

তিতুনি জানালার দিকে তাকাল, শিক কোনোটাই বাঁকা নয়। অন্য-তিতুনি দাঁত বের করে হাসল, বলল, "আবার সোজা করে রেখেছি।"

তিতুনি চোখ বড় বড় করে তাকাল, এই মোটা মোটা লোহার শিক কেমন করে বাঁকা করল? কেমন করে আবার সোজা করল? অন্য-তিতুনি বলল, "আজকে তোমার কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমি খেয়ে এসেছি।

"খেয়ে এসেছ? কোথা থেকে খেয়ে এসেছ?"

"ঐ তো!" বলে অন্য-তিতুনি বিষয়টা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল।

তিতুনি চাপা গলায় যতটুকু সম্ভব কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কোথা থেকে খেয়ে এসেছ?"

তিতুনির কঠিন গলায় কথা বলার কারণ আছে, কারণ সে যেখান থেকেই খেয়ে আসুক সবাই ধরে নিয়েছে এটা তিতুনির কাজ। তিতুনি আবার চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "বলো কোথায় খেয়ে এসেছ?"

অন্য-তিতুনি একটু লাজুক মুখে বলল, "মাহতাব চাচার বাসা থেকে।"

তিতুনি চোখ কপালে তুলে বলল, "মা-হ-তা-ব চা-চা-র বাসা থেকে, তুমি মাহতাব চাচার বাসায় গিয়েছিলে? ভাত খেতে?"

"জোর করে খাইয়ে দিলেন। চাচি খুবই সুইট। মাহতাব চাচার ছোট বাচ্চাটা খুবই কিউট।"

তিতুনির তখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, সে চোখ দুটো কপালে তুলেছিল সেগুলো কপালে রেখেই বলল, "তুমি শুধু ভাত খেতে মাহতাব চাচার বাসায় চলে গেলে? তোমার লজ্জা করল না?"

মেয়েটা আবার দাঁত বের করে হাসল, "লজ্জা করবে কেন? আমার জায়গায় তুমি হলে তুমিও চলে যেতে।"

ঠিক তখন দরজা খুলে আম্মু ঘরের ভেতর ঢুকলেন, তিতুনি ঘুরে আম্মুর দিকে তাকাল, এখন আম্মু নিশ্চয়ই একটা ভয়ংকর চিৎকার করে উঠবেন, কিন্তু আম্মু চিৎকার করলেন না, হাতে ধরে রাখা একটা ব্যাগ তিতুনির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নে, এইখানে তোর জিনিসগুলি রাখ।"

তিতুনি তার বিছানার দিকে তাকাল, এক সেকেন্ড আগেও সেখানে অন্য-তিতুনি লম্বা হয়ে শুয়েছিল, এখন সেখানে কেউ নেই। কোথায় গেল মেয়েটা?

আম্মু তার ঘরের চারিদিকে তাকালেন, বললেন, "ঘরের কী অবস্থা করে রেখেছিস? একটু পরিষ্কার করতে পারিস না?"

তিতুনি চোখের কোনা দিয়ে মেয়েটাকে তখনো খুঁজে যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে। মেয়েটা বিছানায় গড়িয়ে এক পাশে চলে গিয়ে চাদরের নিচে ঢুকে গেছে, তাই চোখের সামনে নেই। আম্মু বিছানার দিকে ভালো করে তাকালেই দেখতে পাবেন বিছানার এক কোনায় এলোমেলো চাদরের নিচে একজন মানুষ। কিন্তু আম্মু সেদিকে তাকালেন না, তাকালেও দেখলেন না। একজন মানুষ যেটা দেখবে বলে আশা করে না সেটা মনে হয় দেখেও দেখে না।

ব্যাগটা তিতুনির হাতে দিয়ে বললেন, "একটা-দুইটা ভালো জমা নিবি। খালি রং ওঠা টি-শার্ট নিয়ে রওনা দিবি না।"

তিতুনি দুর্বলভাবে বলল, "টি-শার্ট পরতে আরাম–"

"এত আরামের দরকার নাই। খুব সকালে উঠতে হবে। এখন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়।"

আম্মু নিজের মনে গজগজ করতে করতে বের হয়ে গেলেন। তখন চাদরের নিচ থেকে মাথা বের করে অন্য-তিতুনি উঁকি দিল, চোখ পিটপিট করে আসল তিতুনির দিকে তাকিয়ে একটু হাসার ভঙ্গি করল।

তিতুনি ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে আম্মু দেখলেন না কেন?"

"অনেক তাড়াতাড়ি সরে গেছি তো, তাই।"

"অনেক তাড়াতাড়ি সরেছ তো কী হয়েছে? সরতে দেখা যাবে না কেন?"

"যখন ফ্যানের পাখা ঘুরতে থাকে তখন তুমি সেটা দেখো?"

তিতুনি চোখ বড় বড় করে বলল, "তুমি ফ্যানের পাখার মতো তাড়াতাড়ি যেতে পারো?"

অন্য-তিতুনি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কেমন জানি ঘাড় ঝাঁকাল। উত্তর দিতে না চাইলে আসল তিতুনি যেভাবে ঘাড় ঝাঁকায়।

চাদরের নিচ থেকে বের হয়ে মেয়েটা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কাল ঢাকা যাচ্ছ?"

তিতুনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি যেতে চাই না।"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, "জানি।"

"কিন্তু না যেয়ে উপায় কী? যেতেই হবে।"

মেয়েটা আবার মাথা নাড়ল, বলল, "জানি।"

"তোমাকে এই দুই দিন একা একা থাকতে হবে। তুমি তো আর আমাদের সাথে মাইক্রোবাসে ঢাকা যেতে পারবে না।"

মেয়েটা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "জানি।"

"যখন আমি নাই তখন তোমার বাইরে ঘোরাঘুরি করা ঠিক হবে না। পরিচিত কেউ দেখে ফেললে অবাক হয়ে যাবে।"

মেয়েটা আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "জানি।"

তিতুনির তখন তাদের স্কুল এবং ফাক্কু স্যারের কথা মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আজকে ক্লাশে কী হয়েছিল? তুমি ফাক্কু স্যারকে টাইট করেছ?"

"নাহ্ সে রকম কিছু না। শুধু ব্রেনের ভেতর আকার-উকার বলার অংশটা মুছে দিয়েছি। এখন ঠিক করে কথা বলতে পারছে না।"

তিতুনি বলল, "আমি যখন বললাম হোম ওয়ার্কের কথাটা ব্রেন থেকে মুছে দিতে তখন রাজি হলে না, এখন পুরো আকার-উকার মুছে দিয়েছ? এখন কোনো দোষ হয়নি?"

"এটা অন্য ব্যাপার। আকার-উকার মুছে দিলেও ক্ষতি নাই। আস্তে আস্তে আবার শিখে নিবে। একটা স্মৃতি মুছে দিলে সেটা আর ফেরত আসবে না। আমি সেটা করতে পারব না।"

"তোমার ঢং দেখে আমি বাঁচি না।"

মেয়েটা তিতুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার সমস্যাটা কি জানো?

"কী?"

"তোমার মনে থাকে না যে আমি দূর গ্যালাক্সি থেকে আসা একটি এলিয়েন। তুমি মনে করো আমিও বুঝি তোমার মতো বোকাসোকা একটা মেয়ে।"

তিতুনি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "আমি বোকাসোকা?"

অন্য-তিতুনি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে এখন ঘুমাও। মনে আছে তোমার খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে?"

তিতুনি বলল, "আগে আমার ব্যাগ গোছাতে হবে।"

"সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমি তোমার ব্যাগ গুছিয়ে দেব।"

"তুমি পারবে?"

"এইটা হচ্ছে তোমার দুই নম্বর সমস্যা। তুমি ভুলে যাও যে আমি হচ্ছি তুমি। একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুমি। বলা উচিত হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন পারসেন্ট তুমি!

"সেইটাই হচ্ছে সমস্যা।"

তিতুনি বালিশে মাথা রাখতেই ঘুমিয়ে গেল। এটা কী তার নিজের সত্যিকারের ঘুম নাকি অন্য-তিতুনি কোনো একটা কায়দা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল সে বুঝতে পারল না।

ঠিক যত সকালে তার ঘুম থেকে ওঠা উচিত তিতুনির ঘুম ভাঙল তার থেকে পরে। ঘুম থেকে উঠে সে বাসার ভেতরে অন্যদের কথা শুনতে পেল, এবং রীতিমতো আঁতকে উঠল। শুনল আম্মু বলছেন, "টোটন, তুই তোর ঘরের জানালা বন্ধ করেছিস?"

"করেছি আম্মু।"

"মনে আছে একবার জানালা খুলে রেখে গেলি, বৃষ্টিতে ঘরবাড়ি ভেসে গেল। আমার এত দামি টেবিল ক্লথের বারোটা বাজিয়ে দিলি।"

টোটন বলল, "না আম্মু, এইবার জানালা বন্ধ করে এসেছি।"

তখন আম্মু বললেন, "তিতুনি। তুই?"

তিতুনি নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনল, অন্য-তিতুনি বলছে, "জি আম্মু, আমার ঘরের জানালা বন্ধ।"

তার মানে অন্য-তিতুনি আম্মু, আব্বু আর টোটনের সাথে ঢাকা যাচ্ছে। তাকে এখানে একা ফেলে রেখে। এখন সে কী করবে? চিৎকার করে বলবে, "আমি আসল তিতুনি? আমাকে নিয়ে যাও।"

তিতুনি শুনল আব্বু বলছেন, "সবাই বের হও। মাইক্রোবাস অপেক্ষা করছে। ট্রাফিক জ্যাম শুরু হবার আগে পৌঁছে যেতে হবে।"

টোটন বলল, "চলো আব্বু।"

তিতুনি শুনল অন্য-তিতুনি বলছে, "আমি রেডি।"

তারপর মনে হলো সবাই দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে গেল। এখন সে কী করবে? চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বের হবে? বলবে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমাকে নিয়ে যাও।" সবাই তখন হাঁ করে তার দিকে তাকাবে? অন্য-তিতুনি তখন সবার ব্রেনে ঢুকে সবকিছু মুছে দেবে? তখন কে যাবে? সে নাকি অন্য-তিতুনি?

তিতুনি সাবধানে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। বাসার সামনে হালকা নীল রঙের একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। পিছনের হুড খুলে সব ব্যাগ রাখা হচ্ছে। ব্যাগ ওঠানোর পর ড্রাইভার হুড বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। আব্বু আর আম্মু উঠলেন। টোটন সামনে বসতে চাচ্ছিল আব্বু বসতে দিলেন না, মুখ ভোঁতা করে সে পিছনে বসল। তার সাথে অন্য-তিতুনি। আসল তিতুনি নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে, কত বড় ধড়িবাজ মেয়ে! তাকে ফেলে রেখে নিজে আসল তিতুনি সেজে ঢাকা চলে যাচ্ছে।

তিতুনি কী করবে ঠিক করার আগেই ড্রাইভার গাড়িতে উঠে মাইক্রোবাসটা স্টার্ট করে রওনা দিয়ে দিল। দেখতে দেখতে সেটা

বাসার সামনের সড়কে উঠে যায়, তারপর সড়ক ধরে ছুটতে থাকে। কয়েক মিনিটের মাঝে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিতুনির প্রথম অনুভূতিটা হলো ভয়ের, তার বাসার সবাই তাকে ঘরের ভেতর তালা মেরে চলে গেছে। তিতুনির মনে হলো অনেক দিন পর তার আব্বু-আম্মু বাসায় এসে দেখবে সে বাসায় না খেতে পেয়ে মরে পড়ে আছে। তখন তার মনে পড়ল বাসার ফ্রিজে অনেক খাবার, সে আর যেভাবেই হোক না খেয়ে মারা যাবে না। তখন মনে হলো এই বাসার ভেতরে তালাবদ্ধ হয়ে থেকে সে পুরোপুরি পাগল হয়ে যাবে। তখন মনে পড়ল বাসার সামনের দরজায় তালা দেয়া আছে সত্যি কিন্তু সে ইচ্ছে করলেই বাসার পিছনের দরজার ছিটকিনি খুলে বের হতে পারবে। তখন মনে হলো রাত্রি বেলা যখন একা একা ঘুমাতে হবে তখন ভূতের ভয়ে সে হয়তো হার্টফেল করে মরে যাবে। চিন্তা করেই এই সকালবেলা দিনের আলোতেই তার হাত-পা কাঁপতে থাকে।

জোর করে সে মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দেয়। তিতুনি প্রথমে বাথরুমে গিয়ে দাঁত ব্রাশ করে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে বাসার ভেতরে এলো। ফ্রিজ খুলে দেখল খাওয়ার কী আছে। এমনিতে সকালবেলা তার কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করে না। যেহেতু আজকে সে জানে খাবার ব্যবস্থা নেই, তাই খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করতে শুরু করেছে।

তিতুনি এক স্লাইস রুটি, একটা কলা আর আধ গ্লাস দুধ মাত্র খেয়ে শেষ করেছে ঠিক তখন বাসার বাইরে সে মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেল।

তিতুনি অবাক হয়ে জানালার কাছে গিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকায়, ঠিক তাদের বাসার সামনে বেশ কয়েকজন মানুষ। তার মাঝে একজন টিশটাশ মেয়ে। দুইজন বিদেশি, একজনের মাথার চুল পাকা অন্যজনের মাথায় ধুধু টাক। বিদেশি দুইজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যেরা বাসার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। টিশটাশ মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, "এইটা সেই বাসা?"

জিনস আর টি-শার্ট পরা একজন বলল, "হ্যাঁ, এইটা সেই বাসা।"

"তুমি কেমন করে জানো?"

"আমি জানি। স্পেসশিপ ট্র্যাকিং ডাটা থেকে দেখেছি এই বাসার ঠিক পিছনে এলিয়েন স্পেসশিপ ল্যান্ড করেছে।"

"কেউ টের পেল না কেমন করে?"

"সবাই টের পেয়েছে কিন্তু সবাই মনে করেছে মাইল্ড ট্রেমার। ভূমিকম্প। এটা যে একটা স্পেসশিপ ল্যান্ড করেছে কেউ বুঝতে পারেনি।"

"ও।"

জিন্স আর টি-শার্ট পরা মানুষটা তিতুনিদের বাসাটার উপরে-নিচে তাকিয়ে বলল, "এলিয়েনটা স্পেসশিপ থেকে বের হয়ে এই বাসায় ঢুকেছিল।"

"তুমি কেমন করে জানো?"

"আমাদের ডাটা থেকে আন্দাজ করছি।"

"এই বাসায় কে থাকে?"

"ছোট একটা ফ্যামিলি। হাজব্যান্ড, ওয়াইফ, একটা ছেলে আর মেয়ে।"

টিশটাশ মেয়েটা বলল, "বাসায় তো তালা মারা।"

"হ্যাঁ। পুরো ফ্যামিলি আজ সকালে বের হয়ে গেছে। মনে হয় একটা ট্রিপে গিয়েছে।"

"বাসাটা তাহলে ফাঁকা?"

"হ্যাঁ ফাঁকা। কেউ নেই।"

"গুড। আমরা নিরিবিলি কিছু ইনভেস্টিগেট করতে পারব।"

"হ্যাঁ। এই ফাঁকে সব যন্ত্রপাতি সেটআপ করে ফেলি।"

তারপর জিন্স আর টি-শার্ট পরা মানুষটা হেঁটে হেঁটে বিদেশি লোক দুজনের কাছে গেল, তাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলল। বিদেশি লোক দুজন তখন খুবই উত্তেজিত হয়ে হাত-পা নেড়ে কথা বলতে থাকে। দূর থেকে তাদের কথা শোনা যাচ্ছিল না, শোনা গেলে তিতুনি কিছু

বুঝত কি না সন্দেহ। বিদেশিদের ইংরেজি খুবই অদ্ভুত, গলার ভেতর থেকে কী রকম একটা শব্দ বের করে কথা বলে।

শুধু একটা কথা শুনতে পেল, "এবারে এই এলিয়েনটাকে ধরতেই হবে। এটা হচ্ছে সারা পৃথিবীর ইতিহাসের একমাত্র সুযোগ।"

অন্যেরাও মাথা নাড়ল, বলল, "ধরতেই হবে।"

তিতুনি জানালা থেকে সরে এলো, তার হাত-পা কাঁপছে। এবারে এলিয়ান তিতুনিকে ওরা ধরে ফেলবে। ভুল করে যদি তাকে ধরে ফেলে? তখন কী হবে?

৮

বাসা থেকে যখন মাইক্রোবাসটা রওনা দিল তখন সবারই মনে একধরনের ফুরফুরে আনন্দের ভাব। সবচেয়ে বেশি আনন্দ টোটনের মনে। সে একটানা কথা বলে যাচ্ছে কিন্তু সে যেহেতু তিতুনিকে মানুষ বলেই বিবেচনা করে না তাই তার কথাবার্তা সব আব্বু-আম্মুর সাথে। কথার বিষয়বস্তু অবশ্যি কম্পিউটার গেম আর ফ্রায়েড চিকেনের বাইরে যাচ্ছিল না।

মাইক্রোবাসটা রওনা দিতেই টোটন বলল, "আব্বু, আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেবে?"

"কী করবি কম্পিউটার দিয়ে?"

টোটন প্রশ্নটা শুনে অবাক হলো, বলল, "কী করব মানে? গেম খেলব। কী ফাটাফাটি গেম আছে তুমি জানো আব্বু?"

আব্বু মাথা নেড়ে জানালেন যে জানেন না। টোটন বলল, "একটা গেম আছে খুবই মজার। তুমি গাড়ি চালাবে আর পাবলিককে চাপা দিবে। যত বেশি চাপা দিবে তত পয়েন্ট।"

আম্মু বললেন, "এটা আবার কী রকম গেম?"

টোটন দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বলল, "যখন একজনকে চাপা দিবে তখন ফটাস করে মাথাটা ফেটে যায়, না হলে ভ্যাড়াৎ করে ভুঁড়ি ফেঁসে যায়–"

আম্মু আবার বললেন, "ছিঃ!"

টোটন তবু থামল না, "মাথার মগজ নাড়ি ভুঁড়ি রক্ত সব ছিটকে ছিটকে যাবে। যা মজার গেম, তোমরা চিন্তাও করতে পারবে না। খুবই রিয়েলিস্টিক।"

আব্বু বললেন, "থাক, অনেক হয়েছে রিয়েলিস্টিক গেম।"

টোটন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার যদি একটা কম্পিউটার থাকত তাহলে দিন-রাত আমি কম্পিউটারে গেম খেলতাম। চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে বাইশ ঘণ্টা।"

অন্য-তিতুনি বেশি কথা বলছিল না। এবারে একটু চেষ্টা করল, জিজ্ঞেস করল, "বাকি দুই ঘণ্টা?"

টোটন মুখ শক্ত করে বলল, "বাকি দুই ঘণ্টা খেতাম। ফ্রায়েড চিকেন।"

অন্য-তিতুনি বলল, "কিন্তু কম্পিউটার তৈরি হয়েছে প্রোগ্রামিং করার জন্যে–"

টোটন বলল, "আমি প্রোগ্রামিংয়ের খেতা পুড়ি।"

অন্য-তিতুনি বলল, "ও!" তারপর থেমে গেল।

টোটন আবার কথা শুরু করল, বলল, "আম্মু, ফুপুর বাসার কাছেই একটা ফ্রায়েড চিকেনের দোকান আছে। যা মজা, তুমি চিন্তাও করতে পারবে না। বেসন দিয়ে মাখিয়ে ডুবা তেলে ভাজে। তেল চপচপ ফ্রায়েড চিকেন। ইয়াম ইয়াম।"

কথা শেষ করে টোটন মুখে লোল টেনে নিল। আব্বু বললেন, "ফ্রায়েড চিকেন একটা খাওয়ার জিনিস হলো?"

টোটন মহা উৎসাহে বলল, "বার্গারও পাওয়া যায়। আর পিতজা।"

টোটন খাওয়ার আলোচনাটা আরো খানিকক্ষণ চালিয়ে যেতে চাইছিল কিন্তু তখন রাস্তার মোড়ে ছোট একটা ভিড় চলে এলো এবং ড্রাইভার এমনভাবে হর্ন দিতে লাগল যে কারো আর কোনো কথা শোনার উপায় থাকল না।

আব্বু একটু বিরক্ত হয়ে ড্রাইভারকে বললেন, "এত জোরে হর্ন দেওয়ার কোনো দরকার আছে? দেখছেন না সামনে ভিড়।"

ড্রাইভার হর্ন থামানোর কোনো লক্ষণ দেখাল না, বলল, "এই মানুষগুলা এমনি এমনি সরবি মনে করেন? এরা সরবি না। হর্ন দিলেও সরবি না। দুই-একটারে চাপা দিলে যদি সরে।"

অন্য-তিতুনি বলল, "ভাইয়ার কম্পিউটার গেমের মতো।"

টোটন না শোনার ভান করে সামনে তাকিয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত ভিড়টা পার হয়ে মাইক্রোবাসটা বড় রাস্তায় উঠে পড়ল এবং তখন হঠাৎ করে সবাই বুঝতে পারল এই ড্রাইভার একেবারে পাগলের মতো গাড়ি চালায়। আব্বু কয়েক মিনিট সহ্য করার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, "ড্রাইভার সাহেব, করছেন কী? আস্তে গাড়ি চালান– অ্যাক্সিডেন্ট হবে তো।"

ড্রাইভার গাড়ির স্পিড কমানোর কোনো নিশানা দেখাল না, গুলির মতো ছুটিয়ে নিতে নিতে বলল, "আমি মতি ড্রাইভার, সতের বছর থেকে গাড়ি চালাই, কুনোদিন এসকিডেন্ট হয় নাইক্কা।"

আব্বু 'এসকিডেন্ট' শব্দটাকে শুদ্ধ করার কোনো চেষ্টা করলেন না, বললেন, "আগে কখনো এসকিডেন্ট হয় নাই মানে না যে এখন হতে পারে না। আস্তে চালান।"

মতি ড্রাইভাই বলল, "আমি আস্তেই চালাবার লাগছি বস। আপনারা বাচ্চাকাচ্চা নিয়া উঠছেন তাই পুরা স্পিড এখনো দেই নাইক্কা।"

কথা বলতে বলতে সে বিপজ্জনকভাবে একটা ট্রাককে ওভারটেক করে সামনের দিক থেকে ছুটে আসা একটা বাসের মুখোমুখি হয়ে গেল, একেবারে কপাল জোরে মুখোমুখি অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বের হয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে বের হতে হতে আবার রাস্তায় চলে এলো। মতি ড্রাইভার হা হা করে হেসে বলল, "দেখলেন বস? হইচে এসকিডেন্ট? হইচে?"

আব্বু নিঃশ্বাস আটকে রেখে বললেন, "না হয় নাই। কিন্তু হতে পারত।"

"হবে নাইক্কা। কুনোদিন হয় নাই।"

মতি ড্রাইভার বিকট স্বরে হর্ন বাজাতে বাজাতে রাস্তা দিয়ে প্রায় উড়ে যেতে লাগল। বাস-ট্রাক ওভারটেক করে যখন খুশি রাস্তার অন্য পাশে যেতে থাকল এবং উল্টো দিক থেকে আসা গাড়িগুলোকে

রীতিমতো ভয় দেখিয়ে রাস্তা থেকে নেমে পাশে সরে যেতে বাধ্য করতে লাগল। একটা ট্যাক্সিকে এভাবে রাস্তা থেকে নামিয়ে আনন্দে হা হা করে হাসতে হাসতে বলল, "বুঝলেন বস? আমারে গাড়ি চালান শিখাইছে আমার ওস্তাদ। ওস্তাদের নাম ছিল বুলবান্দ খান।" মতি ড্রাইভার এই সময় স্টিয়ারিং থেকে হাত ছেড়ে কপাল ছুঁইয়ে তার ওস্ত াদকে সালাম জানিয়ে আবার শুরু করল, "ওস্তাদ ছিলেন কামেল মানুষ। বারো চাক্কার ট্রাক চালাইতেন, কুনো ঘুম ছাড়া একবার বাহাত্তুর ঘণ্টার ট্রিপ দিছিলেন।"

বিপজ্জনকভাবে আরেকটা মাইক্রোবাসকে ওভারটেক করে সামনে থেকে আসা আরেকটা ট্রাকের পাশ দিয়ে বের হয়ে মতি ড্রাইভার আবার শুরু করল, "সেই ওস্তাদ বলত, বুঝলি মতি, গাড়ি চালানোর জন্যে লাগে দুইটা জিনিস। একটা হচ্ছে সাহস। কুনো ভয় পাবি না, সামনে দিয়ে দৈত্যের মতন ট্রাক আসতাছে? গাড়ি নিয়া সামনে দাঁড়াবি, সেই ট্রাক তোরে সাইড দিতে বাধ্য। সেই ট্রাকের বাবা তোরে সাইড দিব।"

আব্বু চোখ কপালে তুলে বললেন, "আপনার ওস্তাদ আপনাকে তাই শিখিয়েছে?"

"জে। একেবারে একশ' ভাগ খাঁটি কথা। অন্য ড্রাইভার ভয় পায়, আমি পাই না। বুকের মাঝে ভয়-ডর থাকলে এই লাইনে আসা ঠিক না। ওস্তাদের জবান খাঁটি জবান।" বলে মতি ড্রাইভার আবার কপালে হাত দিয়ে ওস্তাদকে সালাম জানাল।

টোটন খুবই মনোযোগ দিয়ে ড্রাইভারের কথা শুনছিল, এবারে জিজ্ঞেস করল, "আরেকটা কী?"

"দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে–", হঠাৎ করে মতি ড্রাইভার থেমে গিয়ে রিয়ার ভিউ মিররে পিছনে তাকিয়ে বলল, "নাহ্, সেইটা এখন বলা যাবে না।"

"কেন বলা যাবে না?"

"তুমরা পুলাপান মানুষ, তুমাদের সামনে বলা ঠিক নাইক্কা।"

"কেন বলা ঠিক না বলেন।" টোটনের শোনার খুবই আগ্রহ।

মতি ড্রাইভার খুবই অনিচ্ছার ভঙ্গি করে বলল, "আরেকটা হচ্ছে বোতল।"

"বোতল?" টোটন অবাক হয়ে বলল, "কীসের বোতল?"

আব্বু টোটনকে একটা ধমক দিলেন, বললেন, "তুই চুপ করবি এখন?"

ড্রাইভার অনেকটা নিজের মনে বলল, "ট্রিপ দেওয়ার আগে আধা বোতল, ট্রিপের শেষে আধা বোতল, ব্যস কুনো ঝুট-ঝামেলা নাই।"

আব্বু খুবই বিরক্ত হয়ে বললেন, "আপনি কথা না বলে এখন ঠিক করে গাড়ি চালান।"

ড্রাইভার বলল, "জি বস। গাড়ি চালাই।" বলে গ্যাসের প্যাডালে চাপ দিয়ে মাইক্রোবাসের স্পিড আরো বাড়িয়ে ফেলল। গাড়ির সবাই একেবারে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে।

যেকোনো সময় যা কিছু ঘটে যেতে পারত কিন্তু কিছু ঘটল না। ঘণ্টা খানেক পর যখন ঢাকার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন হঠাৎ দেখা গেল সামনে গাড়িগুলো লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? জ্যাম নাকি?"

মতি ড্রাইভার বলল, "জে না। ক্রসিং।"

"রেল ক্রসিং?"

"জে বস।" বলে সামনের গাড়িগুলোর পিছনে থেমে না গিয়ে সে পাশের ফাঁকা লেন দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। আব্বু ভয় পেয়ে বললেন, "কী হলো? কই যান?"

"ক্রসিং পার হই।"

"ক্রসিং পার হন মানে?"

"এই ট্রেন কখন আসবে কুনো ঠিক আছে? ঠিক নাইক্কা। উল্টা লেনে সামনে গিয়া রেললাইন ক্রস কইরা সামনে আবার ঠিক লেনে উইঠা যামু। আপনি খালি দেখেন।"

আব্বু বললেন, "সামনে রেল গেট ফেলে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে না?"

"পুরাটা করে নাই। মাইক্রো যাওনের ফাঁক আছে।"

"ফাঁক আছে বলেই উল্টা রাস্তায় আপনি এখন রেললাইন ক্রস করবেন?" আব্বু রীতিমতো চিৎকার করে বললেন, "থামান। গাড়ি থামান।"

ড্রাইভার আব্বুকে সান্ত্বনা আর সাহস দেয়, "বস, এত ঘাবড়ান কীসের লাইগ্যা? কুনো ভয় নাইক্কা। আর এইখানে গাড়ি থামানুর উপায় আছে?" বলে সে মাইক্রোবাসটা একেবারে রেল গেটের কাছে এসে উল্টো লেন থেকে বাঁকা হয়ে রেললাইনের উপর উঠে পড়ল। সাথে সাথে দূর থেকে ট্রেনের প্রচণ্ড হুইসিলের শব্দ শোনা যায়, প্রচণ্ড গতিতে দৈত্যের মতো একটা ট্রেন আসছে। ট্রেনের হুইসিল শুনে এইবার মতি ড্রাইভার পর্যন্ত ঘাবড়ে যায়। ট্রেন লাইনটা সোজাসুজি পার না হয়ে কোনাকুনি পার হওয়ার চেষ্টা করছে বলেই কি না কে জানে মাইক্রোবাসটা শেষ মুহূর্তে রেললাইনের উপর আটকে গেল। ট্রেনের ইঞ্জিন বিকট শব্দে হুইসেল দিয়ে এগিয়ে আসছে, ভয়ে-আতঙ্কে গাড়ির ভেতরে সবাই চিৎকার করে উঠল। মতি ড্রাইভার পাগলের মতো শেষবার চেষ্টা করল, গ্যাস প্যাডেলে প্রাণপণে চাপ দিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করার পর হঠাৎ গাড়িটা কোনোভাবে ছুটে এলো এবং একটা ঝটকা দিয়ে সেটা লাইন থেকে সরে যেতেই দৈত্যের মতো বিশাল ট্রেনটা প্রচণ্ড হুইসেল দিতে দিতে বাতাসের ঝাপটা দিয়ে গাড়িটার একেবারে গা ঘেঁষে বের হয়ে গেল।

মতি ড্রাইভার কোনোমতে গাড়িটাকে রাস্তার ওপর তুলে এবারে ঠিক লেনে ছুটে যেতে থাকে। আব্বু একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিলেন, কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "ড্রাইভার সাহেব, গাড়ি থামান।"

"কী বললেন বস? গাড়ি থামামু?"

"হ্যাঁ। গাড়ি থামান।"

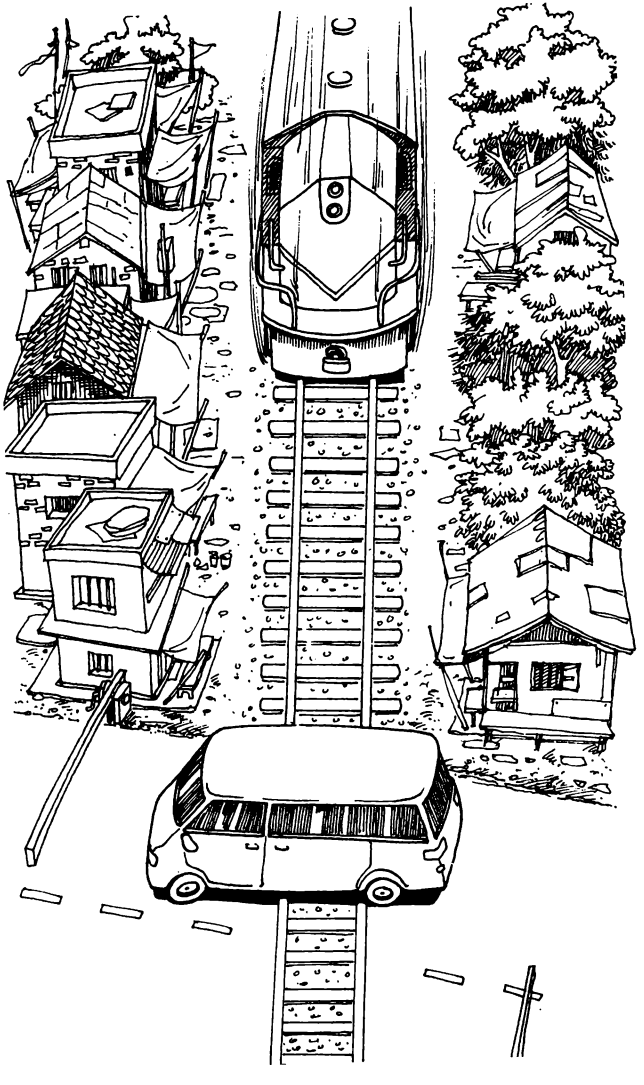

ট্রেন ক্রসিংয়ের জন্যে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর পাশে দিয়ে ছুটে যেতে যেতে ড্রাইভার বলল, "কী জন্যে বস?"

আব্বু গর্জন করে বললেন, "বলছি গাড়ি থামান।"

মতি ড্রাইভার বলল, "কিছু তো হয় নাইক্কা।"

"কিছু হয়েছে কী হয় নাই আমি সেটা নিয়ে কথা বলছি না। গাড়ি থামান।"

আম্মুও এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন, কাঁপা গলায় বললেন, "গাড়ি থামান।"

টোটনও যোগ দিল, বলল, "থামান, গাড়ি থামান।" শুধু অন্য-তিতুনি কিছু বলল না। মতি ড্রাইভার নার্ভাসভাবে একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "বস, গাড়ি তো এখন থামান যাবে নাইক্কা। দিরং হয়ি যাবি। আপনাদের নামানোর পর আরেকটা বড় ট্রিপ আছে কক্সবাজার। ঐ ট্রিপ তো মিস করা যাবি না। কাস্টমার খুব ত্যাড়া।"

আব্বু হুংকার দিয়ে বললেন, "আমি কিছু শুনতে চাই না। গাড়ি থামান, আমরা নেমে যাব।"

সামনের দিক থেকে আসা আরেকটা ট্রাককে খুবই বিপজ্জনকভাবে পাশ কাটিয়ে গিয়ে মতি ড্রাইভার মুখ শক্ত করে বলল, "রাগ করেন ক্যান বস। আমি বলছি গাড়ি থামান যাবি না।"

মতি ড্রাইভার কথা শেষ করার আগেই গাড়ির ইঞ্জিন একটা বিদঘুটে শব্দ করল, গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিল, তারপর কেমন যেন কাশির মতো শব্দ করতে করতে রাস্তার পাশে থেমে গেল। কেন হঠাৎ করে গাড়ির ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেল সেটা অন্য-তিতুনি ছাড়া আর কেউ জানল না। একটু আগে ট্রেন লাইনে আটকে যাওয়া মাইক্রোবাসটা কেমন করে শেষ মুহূর্তে ছুটে এসেছে সেটাও কেউ জানে না। পুরো রাস্তার বিপজ্জনক ওভারটেকগুলোতে প্রত্যেকবার কেমন করে নিরাপদে পার হয়ে এসেছে সেটাও অন্য-তিতুনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

গাড়িটা থেমে যাওয়াতে মতি ড্রাইভার খুবই অবাক হলো, দাঁতে দাঁত ঘষে চাপা গলায় একটা গালি দিয়ে বলল, "আরে, একি মুসিবত! মাত্র সার্ভিসিং করছি, ধোলাইখাল থেকে রিকন্ডিশন ইঞ্জিন ফিট করছি, এখন রাস্তার মাঝে গাড়ি বন হইল, ব্যাপারটা কী?"

ব্যাপারটা কী সেটা নিয়ে আব্বু-আম্মু কিংবা টোটনের কোনো আগ্রহ নেই। অন্য-তিতুনি যেহেতু এটা ঘটিয়েছে তারও কোনো আগ্রহ নেই। আব্বু গাড়ির দরজা খুলে সবাইকে নিয়ে নেমে পড়লেন। মেঘস্বরে ড্রাইভারকে ডেকে বললেন, "ড্রাইভার সাহেব, গাড়ি থেকে নামেন। আপনার সাথে কথা আছে।"

মতি ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামার কোনো আগ্রহ দেখাল না। তার সিটে বসে কিছুক্ষণ খুটখাট করে আবার গাড়ি স্টার্ট করার চেষ্টা করল আর সত্যি সত্যি হঠাৎ ইঞ্জিনটা স্টার্ট নিয়ে নেয়। ড্রাইভার গাড়ির ভেতরে বসে আনন্দের মতো শব্দ করে বলল, "উঠেন গাড়িতে। গাড়ি স্টার্ট নিছে।"

আব্বু বললেন, "রাখেন আপনার গাড়ি। আগে নিচে নেমে আসেন।"

মতি ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ না করেই দরজা খুলে খুবই অনিচ্ছার সাথে তার ড্রাইভারের সিট থেকে নিচে নেমে এলো। মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে রেখে সে কাছে এসে রুক্ষ গলায় বলল, "কী হইছে বস? আপনার সমিস্যা কী?"

"আমার কোনোই সমস্যা নেই। আমরা আপনার গাড়িতে যাব না। আমাদের ব্যাগগুলো নামিয়ে দেন।"

আব্বুর কথা শুনে সে খুবই অবাক হয়েছে এই রকম ভান করল, তারপর কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। হঠাৎ করে মনে হলো তার মাথাটা ঘুরে উঠেছে, হাত বাড়িয়ে মাইক্রোবাসটাকে ধরে সে তাল সামলানোর চেষ্টা করে। তার চোখগুলো ঘুরতে থাকে, দেখে মনে হয় সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

আব্বু ভয় পেয়ে বললেন, "কী হয়েছে? আরে কী হয়েছে আপনার?"

ড্রাইভার কোনো কথা বলল না, তারপর হঠাৎ কেমন জানি জেগে উঠে পিটপিট করে সবার দিকে তাকাল। আব্বু বললেন, "ঠিক আছেন আপনি?"

"জে বস ঠিক আছি।" মতি ড্রাইভার হাত দিয়ে তার কপালটা মুছে বলল, "হঠাৎ মাথাটা কেমন জানি ঘুরে উঠল। জে বস আপনি কী যেন বলছিলেন?"

"আমি বলেছি যে আমরা আপনার গাড়ি করে যাব না। আমাদের ব্যাগগুলো নামিয়ে দেন।"

ড্রাইভার কেমন জানি শূন্য দৃষ্টিতে আব্বুর দিকে তাকিয়ে রইল, মনে হলো আব্বুর কথা সে কিছুই শুনছে না। আব্বু বললেন, "কী হয়েছে আপনার?

"ভুলে গেছি।"

"কী ভুলে গেছেন?"

"গাড়ি চালানো।"

আব্বু অবাক হয়ে বললেন, "গাড়ি চালানো ভুলে গেছেন মানে?"

মতি ড্রাইভার আব্বুর কথার উত্তর না দিয়ে হেঁটে হেঁটে ড্রাইভারের দরজার কাছে দাঁড়াল, কেমন যেন ভয়ে ভয়ে ভেতরে তাকাল। আব্বু এবং সাথে অন্য সবাই তার পিছু পিছু এগিয়ে গেল। ড্রাইভার আব্বুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে কেমুন করে?"

আব্বু কয়েক মুহূর্ত মতি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন চাবি দিয়ে?"

"চাবি কই?" বলে সে উপরে-নিচে তাকাতে লাগল। গাড়ির চাবি কোথায় থাকে সে আর জানে না।

আব্বু বললেন, "ঐ যে, স্টিয়ারিংয়ের নিচে।"

"ইস্টিয়ারিং? ইস্টিয়ারিং কী?"

আব্বু অবাক হয়ে বললেন, "আপনি সত্যিই স্টিয়ারিং হুইল কি সেইটা ভুলে গেছেন?"

"জে বস। সব ভুলে গেছি।" বলে সে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল, জিজ্ঞেস করল, "কোনটা ইস্টিয়ারিং?"

আব্বু স্টিয়ারিং হুইলটা দেখালেন। মতি ড্রাইভার খুব সাবধানে আঙুল দিয়ে সেটা একবার ছুঁয়ে দেখল। তারপর তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল, বলল, "কী আচানক।"

আম্মু বললেন, "আপনার এখন কোথাও বসে মাথায় একটু ঠাণ্ডা পানি ঢালা দরকার। মনে হয় আপনার মাথা গরম হয়ে গেছে।"

মতি ড্রাইভার বলল, "না ম্যাডাম আমার মাথা গরম হয় নাইক্কা, আমি সব ভুলে গেছি।"

"আর কী কী ভুলেছেন? স্ট্রোক হলে মানুষ সবকিছু ভুলে যায়।"

"আর কিছু ভুলি নাইক্কা। সব মনে আছে।"

"আপনার নাম? ঠিকানা? টেলিফোন নম্বর?"

"মনে আছে। সব মনে আছে।"

"শুধু গাড়ি চালানো ভুলে গেছেন? এটা কেমন করে হতে পারে?"

মতি ড্রাইভার একবার মাথা চুলকাল, একবার পেট চুলকাল, তারপর অনেকক্ষণ ধরে বগল চুলকাল, তারপর বলল, "কিছু মনে নাইক্কা। কিছু মনে নাইক্কা।"

সে মাইক্রোবাসটা ঘুরে ঘুরে দেখে, ড্রাইভারের দরজা খুলে কেমন যেন হাঁ করে গাড়ির ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব সাবধানে একবার গিয়ারটা ছুঁয়ে দেখে, নিচে গ্যাস প্যাডেল আর ব্রেকের দিকে তাকায়, তারপর আবার প্রথমে মাথা, তারপর পেট এবং শেষে বগল চুলকাতে থাকে।

আব্বু বললেন, "ইঞ্জিনটা বন্ধ করে রাখেন, শুধু শুধু গ্যাস খরচ হচ্ছে।"

"আমি তো পারমু না। বললাম না ভুলে গেছি।"

আব্বু গাড়ির চাবিটা দেখিয়ে বললেন, "ঐটা ঘোরান। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে।"

মতি ড্রাইভার খুব সাবধানে চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল, তারপর চাবিটা বের করে কেমন জানি অবাক হয়ে গাড়ির চাবিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

আব্বু বললেন, "ড্রাইভার সাহেব, আপনাকে একটা কথা বলি?"

"জে বস। বলেন।"

"এইটা মনে হয় ভালোই হয়েছে যে আপনি গাড়ি চালানো ভুলে গেছেন। এটা কেমন করে সম্ভব আমি জানি না, কিন্তু যেহেতু দেখছি এটা ঘটেছে, মেনে নেন। আপনার জন্যে ভালো, প্যাসেঞ্জারদের জন্য ভালো। আপনি যেভাবে গাড়ি চালান সেটা খুবই ডেঞ্জারাস। আপনি নিজে মারা যাবেন, প্যাসেঞ্জারদের মারবেন। বুঝেছেন?"

"জে বস। বুঝেছি।"

"আপনি অন্য কিছু করেন।"

"অন্য কিছু?"

আব্বু বললেন, "হ্যাঁ। ব্যবসাপাতি। কন্ট্রাক্টরি। আপনার স্বাস্থ্য ভালো আছে, সিকিউরিটির চাকরি নিতে পারেন। বুঝেছেন?"

মতি ড্রাইভার মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি। কিন্তু–"

"কিন্তু কী?"

"আমার ওস্তাদ বুলবান্দ খান দিলে খুবই দাগা পাবে। আমি তার এক নম্বর ছাত্র ছিলাম।"

ওস্তাদ বুলবান্দ খানের এক নম্বর ছাত্র মতি ড্রাইভার মুখটা ভোঁতা করে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চুল, পেট আর বগল শেষ করে এবারে তার কান চুলকাতে লাগল।

গাড়ি থেকে সবার ব্যাগ নামিয়ে একটু হেঁটে সামনে একটা গ্যাস স্টেশন পাওয়া গেল। আব্বু সবাইকে দাঁড় করিয়ে একটা ট্যাক্সি ক্যাব

খুঁজতে গেলেন। ঢাকা শহরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে, এখন খুব সমস্যা হওয়ার কথা না।

এক পাশে দাঁড়িয়ে লাইন বেঁধে গাড়িগুলোকে সি.এন.জি. নেয়া দেখতে দেখতে টোটন আবার তার কথা শুরু করল। যেহেতু তিতুনিকে সে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে না তাই আম্মুকে বলল, "আম্মু, মাইক্রোবাসের ড্রাইভারটা কিন্তু খুবই এক্সপার্ট ড্রাইভার।"

আম্মু ভুরু কুঁচকে বললেন, "এক্সপার্ট?"

"হ্যাঁ। রেল ক্রসিংয়ে মাইক্রোটাকে কেমন করে ছুটিয়ে এনেছ দেখোনি?"

"ঐখানে গিয়ে আটকাল কেন সেটা দেখবি না?"

টোটন সেটাকে বেশি গুরুত্ব দিল না, বলল, "একেবারে কম্পিউটার গেমের মতো গাড়ি চালায়। হুশহাশ করে ওভারটেক করে।"

অন্য-তিতুনি বলল, "খালি একটা পার্থক্য, কম্পিউটার গেমে অনেকগুলো লাইফ থাকে। এইখানে লাইফ খালি একটা।"

একশ' ভাগ সত্যি কথাটার কোনো ঠিক উত্তর দিতে পারল না বলে টোটন খুবই বিরক্ত হয়ে অন্য পাশে সরে গিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। গ্যাস নেয়ার সময় প্যাসেঞ্জারদের গাড়ি থেকে নামতে হয়, তারাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কাছাকাছি খুব ফিটফাট একজন মানুষ, তার ধবধবে সাদা শার্ট, কুচকুচে কালো প্যান্ট, চোখে চশমা, মুখে সিগারেট। মানুষটার মাথায় চুল খুব বেশি নেই কিন্তু যেটুকু আছে তার জন্যে নিশ্চয়ই অনেক মায়া, তাই পকেট থেকে সবুজ রঙের একটা চিরুনি বের করে একবার চুলগুলো আঁচড়ে নিল।

গ্যাস স্টেশনে বেশ কয়েকজন ভিখারি ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করছে। ছোট ছোট কয়েকটা ছেলে-মেয়ে সিদ্ধ ডিম, পপ কর্ন আর আচার বিক্রি করার চেষ্টা করছে। একটা ছোট মেয়ে তার সিদ্ধ ডিমের ঝুড়ি নিয়ে ফিটফাট মানুষটার কাছে গিয়ে সেগুলো বিক্রি করার চেষ্টা

করল। কী কারণ জানা নেই মানুষটা খুবই বিরক্ত হয়ে একেবারে খেঁকিয়ে উঠল, মেয়েটা তারপরেও হাল ছাড়ল না আবার করুণ মুখ করে কিছু একটা বলল। ফিটফাট মানুষটা এবারে রেগে উঠে মেয়েটাকে একটা ধাক্কা মেরে বসে, এর জন্যে মেয়েটা প্রস্তুত ছিল না, তাই একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। ঝুড়ি থেকে বের হয়ে ডিমগুলো ছিটকে পড়ে গড়িয়ে যেতে থাকে। কিছু একেবারে থেঁতলে গেল।

দৃশ্যটা দেখে টোটন মনে হয় একটু আমোদ পেল, তাই ভালো করে দেখার জন্যে আরো কাছে এগিয়ে গেল। তিতুনিও টোটনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। যেন কিছুই হয়নি এ রকম মুখের ভাব করে ছোট মেয়েটা তার গড়িয়ে যাওয়া ডিমগুলো তুলতে থাকে। থেঁতলে যাওয়া ডিমটা বিক্রি করতে পারবে কি না সেটা নিয়ে তার ভেতরে একটু দুর্ভাবনা হয় কিন্তু সেটা নিয়ে সে বেশি মাথা ঘামাল না। তার এই ছোট জীবনে সে প্রতিদিন এর থেকে অনেক বড় বড় বিপদ পার করে। তবে সে নিশ্চয়ই খুবই অবাক হতো যদি জানতে পারত ঝুড়ির ভেতরে থ্যাঁতলানো ডিমগুলো রাখতেই সেগুলো ম্যাজিকের মতো ঠিক হয়ে যাচ্ছে।

অন্য-তিতুনি নিচু গলায় টোটনকে বলল, "কাজটা ঠিক হলো না।"

"কোন কাজটা?"

"এই যে মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। এখন মানুষটার ঝামেলা হবে।"

টোটন ভুরু কুঁচকে বলল, "কী ঝামেলা?"

অন্য-তিতুনি গ্যাস স্টেশনের ছাউনির উপর বসে থাকা কয়েকটা কাককে দেখিয়ে বলল, "ঐ কাকগুলো দেখেছ?"

"কী হয়েছে কাকের?"

"এরা পুরো ব্যাপারটা দেখে খুব রেগে গেছে মনে হয়।"

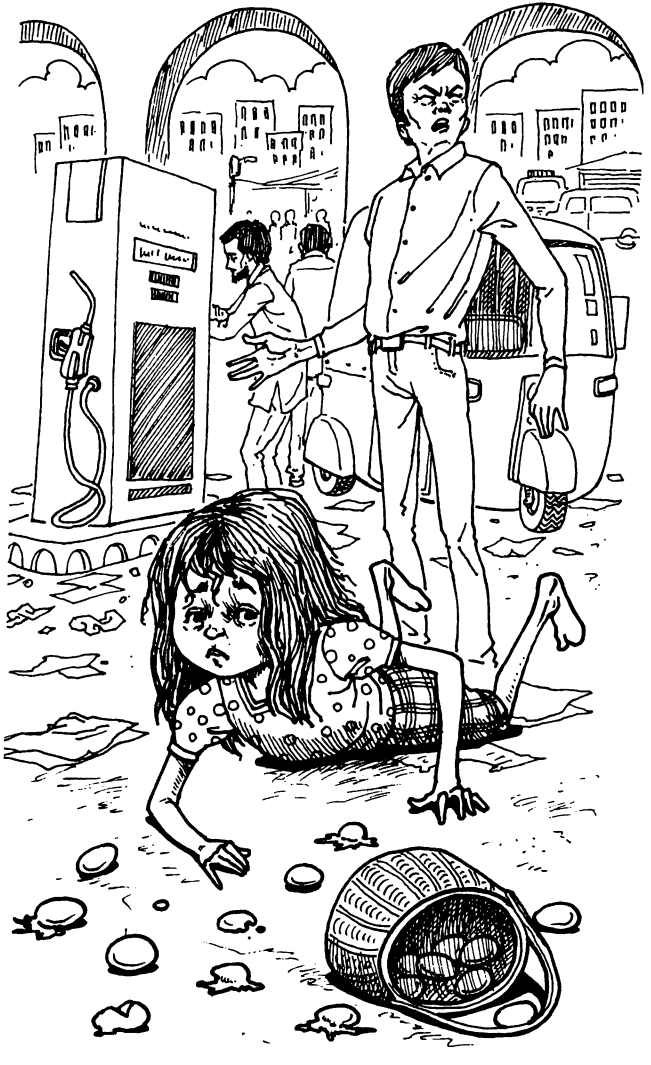

কথাটা শুনে টোটন এমনভাবে তাকাল যেন অন্য-তিতুনির মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে। সে মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি এনে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সত্যি সত্যি একটা কাক ছাউনি থেকে উড়ে এসে ঠিক ফিটফাট মানুষের মাথায় বাথরুম করে দিল। ছোট একটা কাকের পেটে এত বিপুল পরিমাণ বাথরুম থাকতে পারে কে জানত! কারণ দেখা গেল কাকের বাথরুম তার মাথা, চোখ, গাল বেয়ে ধবধবে সাদা শার্ট পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে।

হতচকিত মানুষটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে একবার নিজের দিকে তারপর মাথা উঁচু করে কাকটার দিকে তাকাল। আর ঠিক তখন অন্য কাকগুলো কা কা করে উড়ে এসে মানুষটার মাথা, ঘাড়, মুখে ঠোকরাতে শুরু করে। মানুষটা দুই হাতে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু কাক খুবই ভয়ংকর পাখি, দল বেঁধে থাকলে তাদেরকে ঠেকানো সোজা কথা নয়। মানুষটা নিজেকে বাঁচানোর জন্যে দৌড়ে তার গাড়িটাতে ওঠার চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

কাকগুলো যে রকম হঠাৎ করে এসেছিল ঠিক সে রকম হঠাৎ করে উড়ে আবার তাদের ছাউনির উপর ফিরে গেল। সেখানে বসে খুবই নিরাসক্তভাবে কাকগুলো ফিটফাট মানুষটাকে দেখতে থাকে।

কাকদের এই ঝটিকা আক্রমণ দেখে বেশ কিছু মানুষ ছুটে আসে। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা মানুষটাকে টেনে দাঁড় করায়। চশমাটা ভেঙে গেছে, নাকটা মনে হয় থেঁতলে গেছে। মাথায়, মুখে, ঘাড়ে কাকের ধারালো ঠোঁটের আঘাতের চিহ্ন। বেশিরভাগ মানুষ শুধু কাকের ঝটিকা আক্রমণটুকু দেখেছে, মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে ঢেলে দেয়ার আগের অংশটুকু দেখেনি, তাই তাদের সমবেদনাটা এই মানুষটার জন্যে, তারা হভাগা কাকগুলোকে গালি দিতে দিতে তাকে ঠিকঠাক করার চেষ্টা করতে থাকে।

ছোট মেয়েটা তার সবগুলো সিদ্ধ ডিম ঝুড়িতে ভরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঝুড়িটা দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে মানুষটাকে দেখল, তার

চোখে-মুখে একধরনের ভয়ের ছাপ নেমে আসে। কাকদের এই ঝটিকা আক্রমণের জন্যে তাকেই দায়ী করে তার উপর আরো বড় কোনো শাস্তি নেমে আসবে কি না কে জানে। সে দ্রুত সরে যেতে যেতে একবার টোটন আর অন্য-তিতুনির দিকে তাকাল। অন্য-তিতুনির চোখের দিকে তাকিয়ে সে কী দেখল কে জানে, বিড়বিড় করে নিচু গলায় তাকে বলল, "আল্লাহর মাইর চিন্তার বাইর।"

তারপর সে ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে। ঠিক তখন আব্বু একটা ক্যাব নিয়ে হাজির হলেন। বললেন, "চলো, সবাই ঝটপট উঠে পড়ো।"

৯

দরজা খুলেই বড় ফুপু আনন্দে চিৎকার করে বললেন, "দেখে যা কারা এসেছে।"

তারপর টোটন আর তিতুনিকে জাপটে ধরে আদর করলেন, নাকে-মুখে চুমো খেলেন। যদিও বড় ফুপুর জানার কোনো উপায় নাই যে তিতুনি ভেবে যাকে ল্যাটা-প্যাটা করে চুমু খেলেন সেটা বহু দূর গ্যালাক্সি থেকে আসা একটা এলিয়েন এবং তার চুমু খাওয়াটা ছিল পৃথিবীর মানুষ দ্বারা একটা এলিয়েনকে প্রথমবার ল্যাটা-প্যাটা করে চুমু খাওয়া।

বড় ফুপুর আনন্দের চিৎকার শুনে তার ছেলে-মেয়েরা নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে এলো। সবাই নাদুসনুদুস, ফর্সা এবং গোলগাল, তাদের কেউই টোটন কিংবা তিতুনিকে দেখে এমন কিছু আনন্দের ভাব করল না। মুখে হালকা একটা তাচ্ছিল্যের বাঁকা হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আব্বু আর আম্মু তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন, বললেন, "কী খবর তোমাদের নাদু দিলু মিলু?"

নাদু দিলু মিলু আব্বুর কথা শুনল কি না বোঝা গেল না, কারণ তারা যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। বড় ফুপুর ছেলে-মেয়েদের মাঝে নাদু বড়, বয়সে টোটনের সমান কিন্তু চোখে চশমা আর মোটাসোটা বলে তাকে আরো অনেক বড় দেখায়। তার নাকের নিচে হালকা গোঁফ দেখা দিতে শুরু করেছে, গলার স্বর পরিবর্তন হচ্ছে বলে সেটাতে কন্ট্রোল নেই, তাই আজকাল বেশি কথা বলে না। দিলু দ্বিতীয় ছেলে, একেবারে তিতুনির বয়সী, চোখে চশমা, নাদুর মতোই মোটাসোটা কিন্তু সাইজে তিতুনি থেকে ছোট বলে আরো বেশি

মোটা দেখায়। তিতুনি মেয়ে বলে তাকে পাত্তা না দেয়াটা টোটন আর নাদুর কাছে শিখেছে, কাজেই সেও তিতুনিকে পাত্তা দেয় না। সবচেয়ে ছোট জনের নাম মিলু, বয়স নয়, সে তিতুনিকে বেশ পছন্দই করে কিন্তু বড় দুই ভাই এবং টোটন যেহেতু সব সময় তিতুনিকে হাসি তামাশা ঠাট্টা টিটকারি করে তাই সে ধরে নিয়েছে এটাই নিয়ম। বড় দুই ভাইয়ের কারণে সে বেশি কম্পিউটার গেম খেলায় সুযোগ পায় না বলে চোখে এখনো চশমা ওঠেনি। বড় ফুপু টোটন আর অন্য-তিতুনিকে ধরে ভেতরে আনলেন, আব্বু আর আম্মু পিছনে পিছনে ভেতরে ঢুকলেন। বড় ফুপু বললেন, "ওমা। দেখো, টোটন কত বড় হয়ে গেছে। তিতুনিও দেখি লম্বা হয়েছে।"

আব্বু বললেন, "বুবু, তোমার ওদের সাথে তিন মাস আগে দেখা হয়েছে–তুমি এমন ভাব করছ যে কয়েক বছর পরে দেখছ।"

ফুপু বললেন, "চিন্তা কর, পুরো তিন মাস পরে দেখছি। আর মাঝেমধ্যেই এক-দুই দিনের জন্যে দেখা আর না দেখার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে নাকি?"

আম্মু বললেন, "আপা, আপনারাও তো মাঝে মাঝে আসতে পারেন, গ্রামে আমরা কেমন থাকি না হয় একবার দেখে আসলেন।"

বড় ফুপু বললেন, "অনেক হয়েছে। এখন আমাদের নিয়ে আর টিটকারি কোরো না। এই ঢাকা শহরে মানুষ কীভাবে থাকে মাঝে মাঝে এসে দেখে যেও।"

টোটন বলল, "না বড় ফুপু, ঢাকা শহরই ভালো। গ্রামে কোনো লাইফ নাই।"

বড় ফুপু বললেন, "থাক আমাকে আর লাইফ শিখাতে হবে না। এখন যা হাত-মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নে। একটু পরেই খেতে দেব।"

টোটন বলল, "বেশি করে খেতে দিবে তো বড় ফুপু? আমাদের তিতুনি আজকাল রাক্ষসের মতো খায়।"

তিতুনি রাক্ষসের মতো খায় কথাটা টোটন বেশ নাটকীয়ভাবে বলল আর সেটা শুনে নাদু-দিলু হি হি করে হেসে উঠল আর বড় দুই ভাইকে হি হি করে হাসতে দেখে মিলুও হাসার চেষ্টা করল। নাদু আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি?"

টোটন বলল, "সত্যি না তো মিথ্যা নাকি? আমার কথা বিশ্বাস না করলে আম্মুকে জিজ্ঞেস করে দেখো। একদিন রাত দুইটার সময় আম্মু ঘুম থেকে উঠে দেখে তিতুনি ফ্রিজ খুলে যা পাচ্ছে তা-ই গপগপ করে খাচ্ছে। তাই না আম্মু?"

আম্মু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "খিদে পেয়েছে তো খেয়েছে। তাতে তোর সমস্যা কী? যা এখন বিরক্ত করিস না।"

টোটন বলল, "নাদু, চলো তোমার রুমে যাই। তোমার নূতন গেমগুলি দেখি।"

মিলু বলল, "ভাইয়া যা একটা গেম–", নাদু তখন চোখ পাকিয়ে মিলুর দিকে তাকাল আর মিলু সাথে সাথে কথা বন্ধ করে ফেলল।

নাদুর ঘরে টেবিলে কম্পিউটার মনিটরে একটা অর্ধসমাপ্ত কম্পিউটার গেমের দৃশ্য আটকে আছে। খুবই স্বাস্থ্যবান একজন মানুষ একটা আধা-জন্তু আধা-মানুষকে ধারালো তরবারি দিয়ে গেঁথে ফেলছে। স্ক্রিনটা দেখে টোটনের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। মুখে লোল টানার মতো শব্দ করে বলল, "নূতন গেম?"

নাদু একটা বাঁকা হাসি দিয়ে বলল, "এইটা আর কী গেম! নূতন যে গেমটা এনেছি সেইটা খেললে তোমার কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এইটা খুবই সিক্রেট। এই গেমটা আমেরিকা-জার্মানি আর ফ্রান্সে ব্যান্ড। কেউ খেললে তার এক হাজার ডলার জরিমানা।"

টোটনের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল, "সত্যি?"

"একশ' ভাগ সত্যি। অনেক কষ্ট করে জোগাড় করেছি।"

টোটন মুখে লোল টেনে বলল, "দেখি দেখি।"

নাদু মুখ গম্ভীর করে বলল, "আগে দরজা বন্ধ করতে হবে। মিলু দরজা বন্ধ কর।"

মিলু দরজা বন্ধ করতে গিয়ে থেমে গেল। তাদের ঘরে টোটনের সাথে তিতুনিও ঢুকেছে। তিতুনিকে কেউ তাদের খেলায় চায় না। সবাই তিতুনির দিকে তাকিয়ে রইল। নাদু বলল, "তিতুনি বলে দেবে।"

অন্য-তিতুনি মাথা নাড়ল, বলল, "বলব না।"

"খোদার কসম?"

"খোদার কসম।"

টোটন মুখ শক্ত করে বলল, "বলে দেখুক না, আমি বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিব না?"

নাদু তার কম্পিউটারের ভেতর থেকে গেমটা খুঁজে বের করে লোড করতে থাকে। দিলু অন্য-তিতুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "তিতুনি, তুমি সত্যি এখন রাত দুইটার সময় উঠে রাক্ষসের মতো খাও?"

অন্য-তিতুনি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। খাই।"

কথাটা এত সহজে স্বীকার করে নিবে দিলু মোটেও আশা করেনি, একটু থতমত খেয়ে বলল, "কেন?"

"বেশি বেশি খেয়ে আমি তোমাদের মতো নাদুসনুদুস মোটাসোটা গোলগাল ফুটবলের মতো হতে চাই।"

সবাই চোখ পাকিয়ে তিতুনির দিক তাকাল, শুধু মিলু হি হি করে হাসতে শুরু করল, বলল, "নাদুসনুদুস মোটাসোটা গোলগাল ফুটবল, নাদুসনুদুস মোটাসোটা গোলগাল ফুটবল–"

দিলু মুখ খিঁচিয়ে মিলুর দিকে তাকিয়ে একটা ধমক দিয়ে বলল, "চুপ কর স্টুপিড।" তারপর বড় ভাইয়ের কাছে নালিশ দিয়ে বলল, "দেখেছ ভাইয়া তিতুনি কী বলে?"

টোটন বলল, "তিতুনিটা সব সময় এই রকম বেয়াদবের মতো কথা বলে। একবার বাসায় নিয়ে যাই তো তারপর আচ্ছামতন সাইজ করব।"

দিলু নাক ফুলিয়ে বলল, "করবে তো সাইজ?"

"করব।"

অন্য-তিতুনি বলল, "কে কাকে সাইজ করবে দেখা যাবে।"

টোটন হুংকার দিয়ে বলল, "চুপ কর তিতুনি।"

নাদু বলল, "ছেড়ে দাও ওইসব। তোমার আব্বু-আম্মু তোমার বোনের নাম রেখেছ তিতুনি। তিতুনি মানে তিতা। তিতুনির কথা তো

তিতা হবেই। যদি মিষ্টি কথা বলত তাহলে কি আর তিতুনি নাম রাখে? তাহলে নাম রাখত মিষ্টুনি।"

যুক্তিটা সবারই খুব পছন্দ হলো তখন অন্য-তিতুনি ছাড়া সবাই হি হি করে দুলে দুলে হাসতে লাগল। ঠিক তখন কম্পিউটারের স্ক্রিনে একটা ভয়ংকর কম্পিউটার গেমের ছবি ভেসে ওঠে, তার সাথে বিদঘুটে মিউজিক। স্ক্রিনটা মুছে গিয়ে নূতন আরেকটা ছবি ভেসে আসে। নিচে অনেকগুলো মানুষের মুখ, উপরে অনেকগুলো অস্ত্র। নাদু বলল, "এই যে নিচে, এরা হচ্ছে ভিক্টিম। তুমি আগে ওদের একজনকে বেছে নিবে।" নাদু মাউস নাড়িয়ে একজন মেয়েকে বেছে নিল। সাথে সাথে স্ক্রিনে সেই মেয়েটাকে দেখা গেল। সে ভীত চোখে মাথা ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। খুবই জীবন্ত একটা দৃশ্য। নাদু হাসি হাসি মুখে বলল, "তারপর উপরের অস্ত্রগুলো থেকে টর্চারের একটা অস্ত্র বেছে নিবে। অনেক রকম অস্ত্র আছে, হকি স্টিক, চাবুক, নাম-চাক, ছোরা, চাপাতি, চায়নিজ কুড়াল। তুমি যেটা ইচ্ছা সেটা বেছে নিবে।" নাদু চাবুক বেছে নিতেই মেয়েটার সামনে একটা চাবুক ঝুলতে থাকে। মেয়েটার চোখে-মুখে ভয়টা হঠাৎ করে বেড়ে যায়। সে দুই হাত তার সামনে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। নাদু বলল, "তারপর তুমি মারবে।" নাদু মাউস ক্লিক করতেই শপাং করে চাবুকটা মেয়েটার উপর আছড়ে পড়ল, আর মেয়েটা যন্ত্রণার মতো চিৎকার করে ছটফট করতে থাকে। নাদুর চোখ-মুখে একটা হিংস্র ভাব চলে আসে। সে শপাং শপাং করে স্ক্রিনের মেয়েটাকে চাবুক দিয়ে মারতে থাকে। মেয়েটা চিৎকার করতে থাকে। দেখতে দেখতে চাবুকের আঘাতে তার শরীরের কাপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

নাদু টোটনের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছ কি রিয়েলিস্টিক?"

অন্য-তিতুনি দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল, "ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এই গেম মানুষ খেলে?"

মিলু একটু আশা নিয়ে তিতুনির মুখের দিকে তাকাল। সেও এই গেমটাকে মোটেও পছন্দ করে না। তার দেখতে ভয় লাগে, কান্না চলে আসে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, তিতুনির কথা শুনে

প্রথমবার সে একটু সাহস পেল। বিড়বিড় করে বলল, "আমারও এটা ভালো লাগে না।"

নাদু ধমক দিয়ে বলল, "ভালো না লাগলে নাই। এখানে দাঁড়িয়ে ভ্যাদর-ভ্যাদর করবি না।"

অন্য-তিতুনি মুখ শক্ত করে বলল, "কেউ যদি এই গেম খেলে তাহলে তাকে পুলিশ না হয় র‍্যাবের হাতে ধরিয়ে দেয়া উচিত। তার মাথার চিকিৎসা করানো দরকার।"

সাহস পেয়ে মিলুও জোরে জোরে মাথা নাড়ল। টোটন মুখ খিঁচিয়ে বলল, "খবরদার বড় বড় কথা বলবি না। ভাগ এখান থেকে।" তারপর নাদুকে বলল, "আমাকে দাও, প্লিজ, আমি একটু টর্চার করি।"

নাদু মুখে অহঙ্কারের একটা ভাব এনে বলল, "পরের লেভেলটা আরো ভালো, সেখানে এসিড ছোড়া যায়।"

নাদু সরে টোটনকে বসার জায়গা করে দিল। টোটন মাউসটা হাতে নিয়ে শপাং শপাং করে মেয়েটাকে চাবুক দিয়ে মারতে লাগল আর ঠিক তখন খুবই বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটে গেল। হঠাৎ চাবুকটা একটা ফুলের মালায় পাল্টে গেল। আর সেটা দিয়ে মারার চেষ্টা করতেই ফুলগুলো ঝুরঝুর করে মেয়েটার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ভীত-আতঙ্কিত মেয়েটার মুখ হঠাৎ হাসি হাসি হয়ে যায় আর তার চারপাশে যখন ফুলগুলো ঝরে পড়তে থাকে তখন মেয়েটা আনন্দে খিলখিল করে হাসতে থাকে। সেটা দেখে মিলুও হাততালি দিয়ে আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠল।

নাদু অবাক হয়ে বলল, "এটা কী হলো?" টোটনের কাছ থেকে মাউসটা নিয়ে সে চেষ্টা করল, প্রত্যেকবারই চাবুকের বদলে একটা ফুলের মালা মেয়েটার দিকে ছুটে যাচ্ছে, সেখান থেকে ফুল ঝরে পড়ছে। শুধু তা-ই না, সাথে সাথে মিষ্টি একটা বাজনা হতে থাকে আর মেয়েটা আনন্দে খিলখিল করে হাসতে থাকে।

নাদু প্রায় খেপে যায়, হিসহিস করে বলল, "বাগ, নিশ্চয়ই একটা বাগ। কিন্তু আমি কালকেই খেলেছি, কোনো সমস্যা হয় নাই।"

টোটন বলল, "অন্য একটা অস্ত্র নাও। চাপাতি না হলে চায়নিজ কুড়াল।"

নাদু চায়নিজ কুড়াল বেছে নিল, সত্যি সত্যি এবারে কুড়াল সামনে দুলতে থাকে। কিন্তু কুড়ালটা দিয়ে আঘাত করতেই সেটা হঠাৎ করে একটা আইসক্রিম হয়ে গেল। মেয়েটা হাত বাড়িয়ে আইসক্রিমটা নিয়ে চেটে চেটে খেতে শুরু করে। শুধু যে খেতে থাকল তা-ই না, খুব পরিতৃপ্তির মতো শব্দ করতে লাগল।

নাদু প্রায় হুংকার দিয়ে বলল, "কী হচ্ছে এটা?"

সে আবার আঘাত করার চেষ্টা করতেই আরেকটা আইসক্রিম বের হয়ে আসে। মেয়েটা দ্বিগুণ উৎসাহে সেটাও আরেক হাতে নিয়ে নেয় আর মহানন্দে খেতে থাকে।

মিলু আনন্দে হাততালি দিয়ে বলল, "আমি খেলব। আমি খেলব।"

নাদু গর্জন করে বলল, "চুপ কর পাজি মেয়ে। আমার এত সুন্দর গেমটার বারোটা বেজে গেছে আর সে খেলবে।"

নাদু অস্ত্র হিসেবে ধারালো চাপাতি বেছে নিল, সেটা প্রথমে ঠিকই একটা চাপাতি থাকলেও সেটা দিয়ে কোপ দেওয়া মাত্র সেটা এক স্লাইস চকোলেট কেক হয়ে গেল। মেয়েটা হাত বাড়িয়ে কেকটা নিয়ে খেতে থাকে। শুধু যে খেতে থাকে তা-ই নয়, হাত-পা দুলিয়ে নাচতে থাকে এবং মনে হলো একসময় নাদুর দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপে দিল।

অন্য-তিতুনি হাসি হাসি মুখে বলল, "এইবার গেমটা ঠিক আছে। খুবই সুইট গেম।"

মিলু লাফাতে লাফাতে বলল, "আমি খেলব। আমি খেলব।"

নাদু ধমক দিয়ে বলল, "চুপ কর।"

টোটন বলল, "এটা কেমন করে হচ্ছে?"

শুধু অন্য-তিতুনিই জানে এটা কেমন করে হচ্ছে কিন্তু সে কাউকে বুঝতে দিল না, বলল, "ভাইরাস। কম্পিউটার ভাইরাস। তাই না নাদু ভাইয়া?"

নাদু মেঘস্বরে বলল, "যেটা জানো না সেটা নিয়ে কথা বলো না। কম্পিউটার ভাইরাস একটা প্রোগ্রামকে অন্য কিছু করে দিতে পারে না। এটা খালি নষ্ট করে দিতে পারে, না হলে বন্ধ করে দিতে পারে।"

অন্য-তিতুনি বলল, "তাহলে কম্পিউটার ব্যাক্টেরিয়া।"

নাদু বলল, "কম্পিউটার ব্যাক্টেরিয়া বলে কিছু নাই। বোকার মতো কথা বলো না।"

অন্য-তিতুনি ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, "বোকাদের সাথে বোকাদের মতো কথা না বললে কেমন করে হবে!"

ঠিক তখন ঘরের দরজায় বড় ফুপু ধাক্কা দিলেন, বললেন, "কী হলো? দরজা বন্ধ করে তোরা কী করছিস? বের হয়ে আয়, টেবিলে খাবার দিয়েছি।"

তিতুনি দরজা খুলে বের হয়ে এলো, তার হাত ধরে মিলুও বের হয়ে গেল। ঘরের ভেতর টোটন, নাদু আর দিলু। নাদু বলল, "টোটন, তোমার এই বোনটা খুবই জ্বালাতন করে।"

টোটন বলল, "একবার বাসায় নিয়ে নিই তখন টাইট করে ছেড়ে দেব।"

"বাসাতে নিয়ে না, এইখানেই একবার টাইট করা দরকার। কী সাহস, আমাকে বোকা বলে। আমাদের ক্লাশে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি আমার। গত সপ্তাহেই আমি ফারজানাকে মার খাইয়েছি।"

টোটন জিজ্ঞেস করল, "ফারজানা কে?"

"আমাদের ক্লাশের একটা মেয়ে। হেভি নেকু। আমি নেকু মেয়েদের দুই চোখে দেখতে পারি না।"

টোটন বলল, "আমি মেয়েদেরকেই দেখতে পারি না।"

দিলু এক টিমে থাকার জন্যে বলল, "আমিও।"

নাদু বলল, "আজকে খাবার টেবিলে একবার টাইট দেই।"

"কীভাবে?"

নাদু কয়েক সেকেন্ড মুখ সুচালো করে চিন্তা করল তারপর বলল, "খাবার সময় তিতুনির প্লেটে এক খাবলা লবণ ঢেলে দিই। নাম যেহেতু তিতুনি, একটু তিতা খাবার খেয়ে দেখুক।"

দিলু মাথা নাড়ল, বলল, "খেয়ে দেখুক।"

টোটন জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে লবণ দেবে?"

"আমার উপর ছেড়ে দাও, আমি এটার এক্সপার্ট। এর আগেরবার একটা বিয়ের দাওয়াতে করেছিলাম।"

"কার প্লেটে করেছিলে?"

"চিনি না, আমার পাশে বসেছিল, বেকুব টাইপের একটা ছেলে।"

"কীভাবে করো?"

"খুব সোজা। প্লেটের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে কিছু একটা নেওয়ার ভান করি, তখন অন্য হাতের তলা দিয়ে লবণটা ঢেলে দিই। এই যে এইভাবে–", নাদু করে দেখাল, এবং পদ্ধতিটা দেখে টোটন মুগ্ধ হলো। নাদুর কাছে তার অনেক কিছু শেখার আছে।

নাদু বলল, "শুধু একটা জিনিস দরকার, ঠিক পাশে বসা দরকার।"

খাবার টেবিলে কায়দা করে নাদু তিতুনির পাশে বসে গেল। অন্য পাশে টোটন, দুই পাশে দুইজন বসেছে প্লেটে লবণ ঢেলে দেওয়া আজকে কঠিন হওয়ার কথা না।

বড় ফুপু সবার প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছেন, কথা বলতে বলতে সবাই খাচ্ছে। বড় ফুপু খুব ভালো রাঁধতে পারেন, আজকে সবাই আছে বলে অনেক কিছু রেঁধেছেন। আম্মু খেতে খেতে বড় ফুপুকে বললেন, "আপা, আপনার হাতে জাদু আছে, তা না হলে এত মজার খাবার রাঁধেন কেমন করে?"

বড় ফুপু বললেন, "জাদু না ছাই। তাড়াহুড়ো করে কী রেঁধেছি কী হয়েছে কিছুই জানি না।"

আম্মু বললেন, "খুব ভালো হয়েছে আপা। অসাধারণ।"

আব্বু বললেন, "আসলে বুবুর কোনো ক্রেডিট নাই। এটা আমাদের বংশের ধারা। আমাদের দাদা নাকি পীর ছিলেন। দোয়া করে দিয়েছিলেন এই বংশের সব মেয়ের হাতে জাদু থাকবে, যেটাই রান্না করবে সেটাই হবে অসাধারণ।"

যখন বড়দের এ রকম কথা চলছে ঠিক তখন নাদু অন্য-তিতুনির প্লেটের উপর বাম হাত দিয়ে আচারের বোতলটা নেয়ার ভান করতে করতে করতে ডান হাতে ঢেলে নেয়া এক খাবলা লবণ তিতুনির প্লেটে ঢেলে দিল। নিখুঁত কাজ। নিজের কাজ দেখে নাদু নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায়।

তিতুনি প্লেট থেকে তার খাবার নিয়ে মুখে দিল। নাদু, দিলু আর টোটন চোখের কোনা দিয়ে তিতুনির দিকে তাকিয়ে আছে, এক মুহূর্তের জন্যে অন্য-তিতুনির ভুরু একটু কুঁচকে উঠে তারপর আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়, সে তৃপ্তি করে খেতে থাকে। লবণের জন্যে খেতে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হলো না।

একটু অবাক হয়ে টোটন তার খাবার মুখে দিয়েই চমকে উঠল, তার খাবারের মাঝে এক গাদা লবণ। যেটুকু মুখে দিয়েছে সেটা বের করতেও পারছে না আবার খেতেও পারছে না। নাদু তিতুনির প্লেটে এক খাবলা লবণ দিতে গিয়ে তার প্লেটে দিয়ে দিয়েছে? কী সর্বনাশ! কেমন করে এটা ঘটল? এখন সে কী করবে? টোটন খাবার মুখে নিয়ে বসে থাকে। লবণের তেতো স্বাদ মুখ থেকে ধীরে ধীরে গলার দিকে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে ওয়াক করে বমি করে দেবে।

অন্য-তিতুনি তৃপ্তি করে খেতে খেতে টোটনের দিকে তাকাল। বলল, "ভাইয়া তুমি খাচ্ছ না কেন?"

টোটন মুখে খাবার নিয়ে কোনোমতে বলল, "খাচ্ছি তো। খাচ্ছি।" তারপর মুখে যেটা ঢুকিয়েছিল সেটা কোনোমতে কোঁৎ করে গিলে নিল, তার মনে হলো পুরোটা এক্ষুনি উগড়ে দেবে।

নাদু একটু অবাক হয়ে একবার তিতুনির দিকে তাকাল। ইতস্তত করে বলল, "তিতুনি, খাবার ঠিক আছে?"

অন্য-তিতুনি বলল, "একেবারে ফার্স্ট ক্লাশ। আজকেও আমি রাক্ষসের মতো খাব। একদিনে মোটা হয়ে যাব।"

টোটন একধরনের আতঙ্ক নিয়ে তার প্লেটের দিকে তাকিয়ে আছে, খাবার মুখে দিচ্ছে না। আম্মু বললেন, "কী হলো টোটন, খাচ্ছিস না কেন?"

"কে বলেছে খাচ্ছি না। খাচ্ছি তো!" বলে সে হাত দিয়ে খাবার নাড়াচাড়া করতে থাকে।

বড় ফুপু বললেন, "খাবার মজা লাগছে না?"

টোটন বলল, "লাগছে। লাগছে। অনেক মজা।" তারপর ভয়ে ভয়ে মুখে একটু খাবার নিয়ে মুখ বিকৃত করে বসে থাকে।

নাদু টোটনকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

টোটন বলল, "আমাকে বড় ফুপু বেশি দিয়ে দিয়েছে। তুমি আমার কাছ থেকে একটু নাও।" বলে নাদু কিছু বলার আগেই নিজের প্লেট থেকে প্রায় পুরোটাই নাদুর প্লেটে ঢেলে দিল। নাদু কিছুক্ষণ অবাক হয়ে একবার টোটনের দিকে আরেকবার নিজের প্লেটের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সাবধানে একটু মুখে দিয়ে মুখ বিকৃত করে ফেলল। অন্য-তিতুনি যখন খুব তৃপ্তি করে খাওয়া শেষ করল তখন টোটন আর নাদু দুইজনই একধরনের আতঙ্ক নিয়ে তাদের প্লেটের দিকে তাকিয়ে আছে। দুইজনের কেউই ধরতে পারল না যে খাবারে যেটুকু তেতো ভাব এসেছে সেটা সাধারণ লবণের তেতো না, সেটা অন্য রকম ভয়ংকর তেতো।

খাওয়া শেষে নাদুর ঘরে টোটনের সাথে নাদুর একটা বড় ধরনের ঝগড়া হয়ে গেল। টোটন বলল, "তোমার লবণ দেয়ার কথা ছিল তিতুনির প্লেটে, আমার প্লেটে কেন দিয়েছ?"

নাদু খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বলল, "বুঝতে পারলাম না। আমি তো ভেবেছিলাম আমি তিতুনির প্লেটেই দিয়েছি।"

"না, তুমি দেও নাই। তুমি দিয়েছ আমার প্লেটে–"

নাদু গরম হয়ে বলল, "ঠিক আছে আমি না হয় ভুল করে তোমার প্লেটে দিলাম, তুমি কেন সেটা আমার প্লেটে ঢেলেছ? আমার খাওয়া কেন নষ্ট করেছ?"

"তুমি আমার খাওয়া নষ্ট করতে পারো আর আমি তোমার খাওয়া নষ্ট করতে পারব না?"

ঝগড়া আরো ডালপালা ছড়িয়ে আরো অগ্রসর হতে পারত কিন্তু ঠিক তখন অন্য-তিতুনি আর মিলু ঘরে ঢুকল বলে দুজনে থেমে গেল। টোটন এবং নাদু এই দুজনের কারোই জানার কোনো উপায় ছিল না তাদের কোনো কিছুই এই তিতুনির কাছে গোপন নেই। সে মানুষের মস্তিষ্কের ভেতর ঢুকে নিউরনের সিনাক্স কানেকশন ওলটপালট করে দিতে পারে। তার কাছে একটা প্লেটের লবণ অন্য প্লেটে পাঠানো কোনো ব্যাপারই না। সেই লবণকে একশ' গুণ বেশি তেতো করে দেয়াও তার কাছে পানির মতো সহজ।

১০

আসল তিতুনি চুপচাপ গালে হাত দিয়ে জানালার কাছে বসে আছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। বাইরে অনেক রকম কাজকর্ম চলছে। নানা ধরনের গাড়ি আসছে-যাচ্ছে, গাড়ির ভেতরে কী আছে কে জানে। কেউ যেন সন্দেহ না করে সে জন্যে গাড়িগুলো ঠিক তাদের বাসার সামনে রাখছে না, দূরে নিয়ে রাখছে। একসাথে বেশি মানুষ আসে না, একজন-দুজন আসে। তিতুনি বুঝতে পারছে তাদের বাসাটাকে চারিদিক থেকে নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। বিদেশি মানুষ দুটোও একবার-দুইবার বাসার সামনে থেকে ঘুরে গেছে। যারা তাদের বাসার চারপাশে কাজ করছে তারা কথাবার্তা বলে না, যদি বলতে হয় চাপা স্বরে বলে, তাই কী বলছে ঠিক শুনতে পাচ্ছে না। সে যে বাসার ভেতরে আছে সেটা যেন বাইরের মানুষেরা বুঝতে না পারে সে জন্যে তিতুনি খুবই সাবধানে আছে। চলাফেরা করছে খুবই কম, যদিও বা একটু এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে হয়, নিচু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে।

একটু পরে অন্ধকার হয়ে যাবে, তখন সে আর আলো জ্বালাতে পারবে না, অন্ধকারে থাকতে হবে। অন্ধকারে কেমন করে কী করবে বুঝতে পারছে না। আগে ভেবেছিল ফ্রিজ থেকে কিছু খাবার বের করে গরম করে খেয়ে ফেলবে, এখন সেটাও করতে পারছে না। সারাদিন শুধু রুটি আর কলা খেয়ে কাটিয়ে দিতে হচ্ছে। দুপুরবেলা খুব সাবধানে তিতুনি দুইটা ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছে। রাত্রে একটা ডিম খেয়ে নিবে, ডিমের মাঝে প্রোটিন থাকে, পেটের মাঝে অনেকক্ষণ থাকবে।

ফ্রিজে একটু দুধও আছে। খুব বেশি নেই, তাই একটু বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে খাচ্ছে যেন শেষ না হয়ে যায়। এমনিতে সে একেবারেই দুধ খেতে চায় না। কেমন জানি গন্ধ গন্ধ লাগে, এখন ভিন্ন কথা। বিপদে পড়লে বাঘে নাকি ঘাস খায় আর তিতুনি একটু দুধ খেতে পারবে না?

আজ সকালে তার খুব দুশ্চিন্তা ছিল রাত্রি বেলা সে একা একা কেমন করে থাকবে? ভূতের ভয়ে সে নিশ্চয়ই হার্টফেল করে মরেই যাবে। এখন অবশ্যি ভিন্ন কথা–আজ রাতে আর যেটা নিয়েই ভয় থাকুক ভূতের ভয় হবে না। তাদের বাসা ঘিরে এত মানুষ, এত যন্ত্রপাতি, ভূত নিয়ে ভয় পাবার সুযোগ কোথায়? সময় কোথায়?

কিন্তু তার বুকের ভেতর একটা দুশ্চিন্তা খচখচ করছে। এলিয়েন মেয়েটাকে যদি সত্যি ধরে ফেলে তখন কী হবে? মেয়েটাকে কি জোর করে আটকে রাখবে? পুলিশ যে রকম করে রিমান্ডে নেয় এই এলিয়েন মেয়েটাকেও কী রিমান্ডে নিবে? অত্যাচার করবে? কেটে-কুটে ফেলবে? মেয়েটা যে দেখতে হুবহু তার মতো সেটা নিয়ে কি কোনো সমস্যা হবে?

তিতুনি ভেবে ভেবে কোনো কূল-কিনারা পায় না। এলিয়েন মেয়েটার সাথে একটু কথা বলতে পারলে হতো কিন্তু সে তো ঢাকায় বসে আছে। সেখানে কী যন্ত্রণা পাকাচ্ছে কে জানে। বড় ফুপুর মতো সুইট মানুষ দুনিয়াতে আর একজনও আছে কি না সন্দেহ কিন্তু তার ছেলে-মেয়েগুলো কেমন যেন! টোটনের সাথে খাতির কিন্তু তাকে একেবারে দেখতে পারে না। এলিয়েন তিতুনির সাথে কোনো কিছু নিয়ে বড় ফুপুর ছেলে-মেয়ের লেগে যাবে না তো?

১১

ঢাকায় বড় ফুপুর ফ্ল্যাটটা বড় রাস্তার উপরে, ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় রাস্তা দিয়ে বাস, গাড়ি, টেম্পো যাচ্ছে এবং আসছে। অন্য-তিতুনি প্রায় পুরো সময়টাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাস, গাড়ি, টেম্পো আর মানুষ দেখল। রাস্তার দুই পাশে ফুটপাথ, বেশিরভাগই নানা ধরনের হকাররা দখল করে রেখেছে, যেটুকু ফাঁকা আছে সেখান দিয়ে পিলপিল করে মানুষ যাচ্ছে-আসছে। প্রত্যেকটা মানুষেরই নিজের একটা জীবন আছে এবং সবাই নিজের মতো কিছু একটা ভাবতে ভাবতে যাচ্ছে-আসছে, সেটা অন্য-তিতুনি খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখল। সন্ধ্যেবেলা যখন একটা একটা করে বাতি জ্বলে উঠল, নিয়ন আলো দিয়ে রাস্তার দুই পাশ আলো ঝলমল করতে লাগল, সেটাও অন্য-তিতুনি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। তাকে এ রকম গভীর মনোযোগ দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে একসময় মিলু জিজ্ঞেস করল, "তিতুনি আপু, তুমি কী দেখো?"

অন্য-তিতুনি বলল, "মানুষ দেখি।"

"তুমি আগে মানুষ দেখো নাই?"

অন্য-তিতুনি ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, "দেখব না কেন? দেখেছি। কিন্তু এই উপর থেকে পিলপিল করে হাজার হাজার মানুষ হেঁটে যাচ্ছে দেখতে খুব ভালো লাগে।"

মিলু কিছুক্ষণ এই খুব ভালোলাগার দৃশ্যটা দেখার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুক্ষণেই তার ধৈর্য ফুরিয়ে গেল। মানুষদের দেখার কী আছে কে জানে?

সন্ধ্যেবেলা আম্মু বড় ফুপুকে নিয়ে একটু কেনাকাটা করতে বের হলেন। আম্মু যখনই ঢাকা আসেন তখনই একটু কেনাকাটা করে নিয়ে

যান। অন্য-তিতুনিকে শুধুমাত্র জিজ্ঞেস করার জন্যে বললেন, "তিতুনি যাবি আমাদের সাথে?"

অন্য-তিতুনি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল। আম্মু বেশ অবাক হলেন, কারণ তিতুনি কখনোই ঢাকা শহরে ভিড় ঠেলে দোকানপাটে যেতে চায় না। মিলু ঠিক তার উল্টো, সে সবসময়ই বাইরে যেতে চায়, তাই সেও তাদের সাথে রওনা হলো। বড় ফুপু আর আম্মুর সাথে অন্য-তিতুনি আর মিলু বের হয়ে যাবার সাথে সাথে নাদুর ঘরে নাদু, দিলু আর টোটন মিলে একটা মিটিং শুরু করে দেয়। মিটিং না বলে এটাকে অবশ্যি ষড়যন্ত্র বলাই ভালো, কারণ মিটিংয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে কেমন করে তিতুনিকে একটা সত্যিকারের শিক্ষা দেওয়া যায়, যেন সে সারা জীবনের জন্যে সাইজ হয়ে যায়। নাদু বলল, "টোটন, তোমার বোন মানুষটা খুবই ডেঞ্জারাস।"

টোটন মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি।"

"আমি তার প্লেটে এক খাবলা লবণ দিয়েছি, সে নিশ্চয়ই হাত দিয়ে সেটা ধরে তোমার প্লেটে দিয়ে দিয়েছে।"

টোটন মাথা নাড়ল। নাদু বলল, "তা না হলে এর পর থেকে শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে কেন?"

দিলু মাথা নাড়ল, সায় দিয়ে বলল, "হাসে কেন?"

নাদু বলল, "আমাকে বলে বোকা।"

দিলু বলল, "আমাকে বলে নাদুসনুদুস মোটাসোটা গোলগাল ফুটবল।"

টোটন বলল, "তোমাদের সাথে মাত্র একদিন থেকেছে, এর মাঝে তিতুনি কত কী বলে ফেলেছে। আমার সাথে সারাক্ষণ থাকে, চিন্তা করে দেখো আমার কী অবস্থা।"

নাদু বলল, "কাজেই তাকে ঠিকভাবে সাইজ করা দরকার।"

দিলু বলল, "চুলের মাঝে চিউয়িংগাম লাগিয়ে দেই?"

নাদু মাথা নাড়ল, বলল, "না। এই সব করলে আম্মু বকুনি দিবে। আম্মু-আব্বু যেন সন্দেহ না করে।"

"তাহলে কী করব?"

"এমন একটা কাজ করব যেটা দিয়ে সারা জীবন তিতুনিকে লজ্জা দেয়া যায়।"

টোটনের চোখ চকচক করে উঠল, "কী কাজ?"

"আগেরবার এটা করেছিলাম মিতুলের উপর। এখন তাকে আর কেউ মিতুলি ডাকে না। সবাই ডাকে হিসুনি।"

"হিসুনি?"

"হ্যাঁ", নাদুর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। "মিতুল হচ্ছে আমার চাচাতো বোন। মাত্র ছয়-সাত বছর বয়স কিন্তু হেব্বি যন্ত্রণা। সারাক্ষণ কথা বলে, এক সেকেন্ড মুখ বন্ধ করে না। ধমক দিলে শুনে না, উল্টা ধমক দেয়। তখন ঠিক করলাম তাকে সাইজ করতে হবে। কি করলাম জানো?"

টোটন আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী?"

নাদু হাসি হাসি মুখে বলল, "জন্মের মতো সাইজ করে দিলাম। কি দিয়ে করলাম জানো?"

"কী দিয়ে?"

"এক গ্লাস পানি।"

টোটন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এক গ্লাস পানি?"

"হ্যাঁ। মিতুল যখন ঘুমিয়েছে বিছানায় তার নিচে এক গ্লাস পানি ঢেলে দিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে বেকুব হয়ে গেল–ভাবল সে বিছানায় হিসু করে দিয়েছে।"

নাদুর বুদ্ধি দেখে টোটন চমৎকৃত হয়ে গেল। নাদু দুলে দুলে হাসতে হাসতে বলল, "মিতুল সকালে ঘুম থেকে উঠে লজ্জায় টমেটোর মতো লাল হয়ে গেল। কারো সামনে মুখ দেখাতে পারে না। আমরা কি ছাড়ি নাকি? টিটকারি করতে করতে মিতুলের বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিলাম। তাকে নিয়ে একটা কবিতা বানালাম–

মিতুল মিতুল হিসুনি
এমন কাম আর করবানি?

তারপর তার পিছে পিছে এই কবিতা বলতে লাগলাম। মিতুল কেন্দেকেটে একাকার। তার নামই হয়ে গেল হিসুনি। হিস্যু থেকে হিসুনি। সেই যে আমাদের বাসা থেকে গিয়েছে আর কোনোদিন আসে নাই।"

টোটন আনন্দে হাততালি দিয়ে বলল, "তোমার কী বুদ্ধি! ফ্যান্টাস্টিক।" তারপর বলল, "আমরা তিতুনির উপরেও এটা করতে পারি না?"

নাদু বলল, "একশ' বার।"

উত্তেজনায় টোটনের চোখ চকচক করতে থাকে, "তিতুনির বেলা কাজটা আরো সোজা হবে। গাধাটা যখন ঘুমায় মড়ার মতো ঘুমায়। কিছু টের পাবে না।"

নাদু গম্ভীর হয়ে বলল, "একেবারে ঠাণ্ডা পানি না নিয়ে পানিটা একটু গরম করে নিতে হবে, শরীরের সমান টেম্পারেচার, তাহলে পানি ঢালার সময়ে টের পাবে না।"

টোটন নাদুর কথায় একেবার মুগ্ধ হয়ে গেল, আবার বলল, "তোমার কী বুদ্ধি নাদু!"

দিলু মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। ভাইয়ার মাথায় অনেক বুদ্ধি।"

"বুদ্ধির তোমরা কী দেখেছ। আরো দেখবে।"

দিলু বলল, "আমরা তিতুনিকে নিয়ে কবিতা বানাব না?"

নাদু বলল, "কবিতা তো বানাতেই হবে। কবিতা ছাড়া কী আর এই প্রজেক্ট শেষ হয় নাকি?"

টোটন চকচকে চোখে বলল, "তিতুনিকে নিয়ে কবিতা বানানো আরো সোজা হবে–আমরা বলতে পারি–

"তিতুনি রে তিতুনি
তুই হলি হিসুনি–"

নাদু বলল, "কিংবা–

হিস্যু হিস্যু হিসুনি
তিতা তিতা তিতুনি।"

দিলু আনন্দে হাততালি দিয়ে দাঁত বের করে হাসতে লাগল। অনেক দিন এ রকম মজা হয়নি।

আম্মু, আর বড় ফুপু মিলু আর অন্য-তিতুনিকে নিয়ে ফিরে এলেন ঘণ্টা দুয়েক পরে। মিলু একটা নূতন পুতুল কিনে এনেছে, সেটা নিয়ে তার উত্তেজনার শেষ নেই। ফুপাও প্রায় একই সময় অফিস থেকে ফিরলেন। ফুপা ব্যাংকে চাকরি করেন। এই সময়ে তার কাজের চাপ অনেক বেড়ে যায়, ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। বড় ফুপুর তুলনায় ফুপা একটু গম্ভীর। ছেলে-মেয়েরা মনে হয় তাকে একটু ভয়ই পায়। টোটনের খুব ইচ্ছা ছিল মোড়ের ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে ফ্রায়েড চিকেন কিনে খাবে কিন্তু বড় ফুপু এত কিছু রান্না করেছেন যে সাহস করে সেটা আর বলতে পারল না। খাবার টেবিলে আব্বু আর ফুপা পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করতে থাকলেন, আম্মু আর বড় ফুপু পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আলোচনা করতে থাকলেন, নাদু, দিলু আর টোটন কম্পিউটার গেম নিয়ে আলোচনা করতে করতে চোখের কোনা দিয়ে তিতুনিকে লক্ষ করতে লাগল। আজ রাতে এক গ্লাস পানি দিয়ে কী ম্যাজিক করে ফেলা হবে সেটা চিন্তা করেই তাদের মন আনন্দে ভরে যাচ্ছিল। মিলু তার ক্লাশের পাজি ছেলেদের নানা রকম কাজকর্মের বর্ণনা তিতুনিকে শুনিয়ে যাচ্ছিল। তিতুনি খুব মনোযোগ দিয়ে সেগুলো শোনার ভান করছিল, যদিও আসলে তার আলাদা করে কিছুই শোনার দরকার নেই, কার মনের ভেতর কী আছে সেগুলো সে খুব ভালো করে জানে।

খাওয়ার পর তিতুনিকে মিলুর সাথে তার নূতন কিনে আনা পুতুলটা নিয়ে খেলতে হলো। নাদু, দিলু আর টোটন নানা রকম ভয়ংকর কম্পিউটার গেম খেলে সময় কাটিয়ে দিল। রাত একটু গভীর হওয়ার পর বড় ফুপু আর আম্মু সবাইকে ঘুমাতে পাঠিয়ে দিলেন। মিলুর ঘরে তার বিছানায় মিলুর সাথে তিতুনি। নাদুর ঘরে মেঝেতে তোষক পেতে আড়াআড়িভাবে নাদু, দিলু আর টোটনের শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঠিক ঘুমানের আগে হঠাৎ নাদু আবিষ্কার করে তার খুবই পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। পরপর দুই গ্লাস পানি খাবার পরও তৃষ্ণা যায় না, তিন নম্বর গ্লাস খাবার পর তার তৃষ্ণা মিটল। নাদুকে এভাবে পানি খেতে দেখে টোটনেরও তৃষ্ণা পেয়ে গেল আর টোটনকে পানি খেতে দেখে কেমন করে জানি দিলুরও তৃষ্ণা পেয়ে গেল। তিনজন যখন শুতে এসেছে তখন তিনজনেরই পানি খেয়ে একটু আঁইটাঁই অবস্থা। বিছানায় শুয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে তারা একসময় ঘুমিয়ে গেল।

ঘুমানোর ঠিক আগে তিন গ্লাস পানি খাওয়ার কারণে গভীর রাতে তলপেটে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করে নাদুর ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকার ঘরে তার পাশে দিলু এবং দিলুর পাশে টোটন মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে। নাদু মশারি তুলে বের হয়ে এলো। আবছা অন্ধকারে বাথরুমে গিয়ে নাদু বাথরুমের বাতিটা জ্বালিয়ে কমোডের দিকে এগিয়ে গেল। হিস্যু করায় মনে হয় একধরনের আনন্দ আছে, বিশেষ করে যখন অনেক বেশি হিস্যুর দরকার পড়ে তখন মনে হয় আনন্দটাও অনেক বেশি। তলপেটের চাপ কমে আসার সাথে সাথে নাদুর একধরনের আরাম হতে থাকে। সে মনে হয় চোখ বন্ধ করে আরামের একধরনের শব্দও করে ফেলল। তখন হঠাৎ তার বিচিত্র একটা অনুভূতি হলো, তার মনে হলো তার শরীরের নিচে একধরনের কুসুম কুসুম গরমের প্রবাহ হচ্ছে এবং ঠিক তখন দ্বিতীয়বার নাদুর ঘুম ভেঙে গেল। নাদুর এক মুহূর্ত সময় লাগল বুঝতে যে এবারে সত্যি সত্যি ঘুম ভেঙেছে, এর আগেরটা ছিল ঘুম ভাঙার স্বপ্ন। নাদুর সারা শরীর দিয়ে আতঙ্কের একটা হিম শীতল প্রবাহ বয়ে যায়, সে চৌদ্দ বছরের একটা দামড়া ছেলে বিছানায় হিস্যু করে দিয়েছে! প্রচণ্ড আতঙ্কে সে পাথরের মতো জমে গেল, এটা কীভাবে সম্ভব? এখন কী হবে? সে তার পাশে তাকাল, দিলু ঘুমাচ্ছে। ঘুমাতে ঘুমাতে ছটফট করে কিছু একটা বলল, তারপর হঠাৎ উঠে বসে পড়ল। দিলু এদিক-সেদিক তাকায়, তারপর নাদুকে ধাক্কা দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ভাইয়া।"

নাদু জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"আমি–আমি–", বলে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদতে শুরু করে।

"আমি কী?"

দিলু বলল, "আমি বিছানা হিস্যু করে দিয়েছি।"

"তুইও? নাদু দিলুর কথা শুনে বিরক্ত না হয়ে কেমন যেন খুশি হয়ে উঠল।

দিলু কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তোমার জন্যে।"

"আমার জন্যে?"

"হ্যাঁ। আমি স্বপ্ন দেখলাম, তুমি আমাকে ধরে বাথরুমে নিয়ে বললে, কর হিস্যু কর আর আমি হিস্যু করে দিয়েছি।"

নাদু বলল, "কাঁদিস না। আমারও বিছানায় হিস্যু হয়ে গেছে।"

দিলু মুহূর্তে কাঁদা বন্ধ করে বলল, "তোমারও?"

নাদু বলল, "হ্যাঁ। আমারও।"

গভীর রাতে দুই ভাইয়ের কথা শুনে টোটনেরও ঘুম ভেঙে গেছে। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "আমারও।"

তখন তিনজন বিছানায় বসে অন্ধকারে একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এটা কী হলো? সকালে তারা বাসার সবার সামনে মুখ দেখাবে কেমন করে? যেদিন তারা তিনজন মিলে ঠিক করেছে তিতুনিকে একটা শিক্ষা দেবে সেদিন উল্টো তাদের তিনজনের একটা উল্টো শিক্ষা হয়ে গেল? এর থেকে বড় হৃদয়বিদারক ঘটনা আর কী হতে পারে? এ রকম কাকতালীয় ঘটনা কি আগে কখনো ঘটেছে? ভবিষ্যতে কখনো ঘটবে? তিতুনি যখন সকালবেলা এটা আবিষ্কার করবে তখন আত্মহত্যা করা ছাড়া তাদের আর কি কোনো গতি আছে?"

ভোরবেলা ব্যাপারটা নিয়ে বাসায় ছোটখাটো একটা উত্তেজনা হলো, তিনজন শুনল মিলু ছুটে গিয়ে তিতুনিকে খবরটা দিচ্ছে।

"তিতুনি আপু কি হয়েছে জানো?"

"কী হয়েছে?"

"ভাইয়া, ছোট ভাইয়া আর টোটন ভাইয়া একসাথে বিছানায় পিশাব করে দিয়েছে। গন্ধে ঘরে যাওয়া যায় না।"

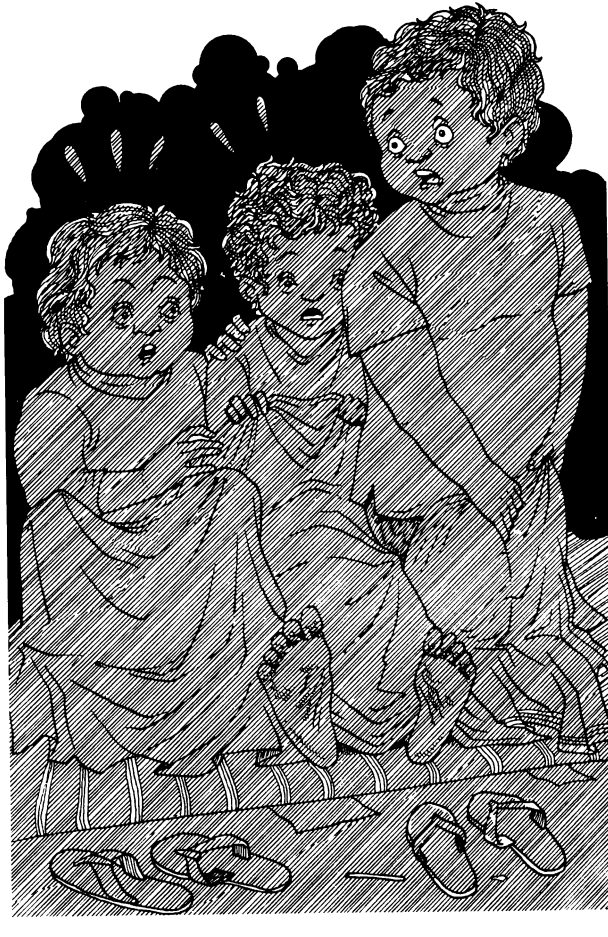

তিনজনই এই সময়ে তিতুনির গলা থেকে একটা আনন্দধ্বনি শোনার অপেক্ষা করছিল, কিন্তু সেটা শুনল না, উল্টো শুনল তিতুনি বলছে, "শ-স-স-স! মিলু এটা নিয়ে কোনো কথা বলো না। ইচ্ছে করে তো করেনি– হঠাৎ হয়ে গেছে, তারা তো বড় হয়ে গেছে, কিছু একটা নিশ্চয়ই কারণ আছে। হয়তো ঘুমানোর আগে বেশি পানি খেয়েছিল। তাদের কোনো দোষ নাই।"

"দোষ নাই?"

"না। ভান করো তুমি কিছু জানো না। আমি কিছু জানি না। মানুষকে কখনো লজ্জা দিতে হয় না।"

মিলু খুবই অনিচ্ছার সাথে বলল, "ঠিক আছে।"

নাদু, দিলু আর টোটন ঘরে বসে একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকায়। একজন যদি আরেকজনকে লজ্জাই না দিবে তাহলে কী দেবে? কী বলে তিতুনি?

১২

ঢাকা থেকে বাসায় ফিরে আসার পুরো সময়টা টোটন কোনো কথা বলল না। আব্বু এবারে আর মাইক্রোবাস ভাড়া করার সাহস পেলেন না, সবাইকে নিয়ে বাসে চলে এসেছেন। বাস থেকে নেমে রিকশা করে বাসার কাছাকাছি এসে একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। বাসার রাস্তার কাছাকাছি পুলিশ ব্যারিকেড করে রেখেছে, কাউকে যেতে দিচ্ছে না। অস্ত্র হাতে একজন পুলিশ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "এই রাস্তায় যেতে পারবেন না। অন্য রাস্তায় যান।"

আব্বু বললেন, "অন্য রাস্তায় যাব মানে? আমার বাসা এই রাস্তায়, আমি অন্য রাস্তায় গিয়ে কী করব? কী হয়েছে এই রাস্তায়?"

"আমি জানি না।"

"কে জানে?"

পুলিশটি এবারে অস্ত্র ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি সেটাও জানি না।"

"আমরা তাহলে কী করব? নিজের বাসায় যেতে পারব না?"

"সেটা আমি জানি না। আমার উপর অর্ডার কাউকে যেতে দেয়া যাবে না।"

আম্মু এবারে রিকশা থেকে নেমে এসে কড়া গলায় বললেন, "কে আপনাকে অর্ডার দিয়েছে তাকে ডেকে আনেন। আমরা কথা বলব।"

আম্মুর তেজি গলায় পুলিশ একটু থতমত খেয়ে গেল। মাথা চুলকে বলল, "আপনারা দাঁড়ান, স্যারকে ডেকে আনি।"

কিছুক্ষণের মাঝেই একজন সুদর্শন পুলিশ অফিসার এসে ভুরু কুঁচকে আব্বুকে জিজ্ঞেস করল, "কোনো সমস্যা?"

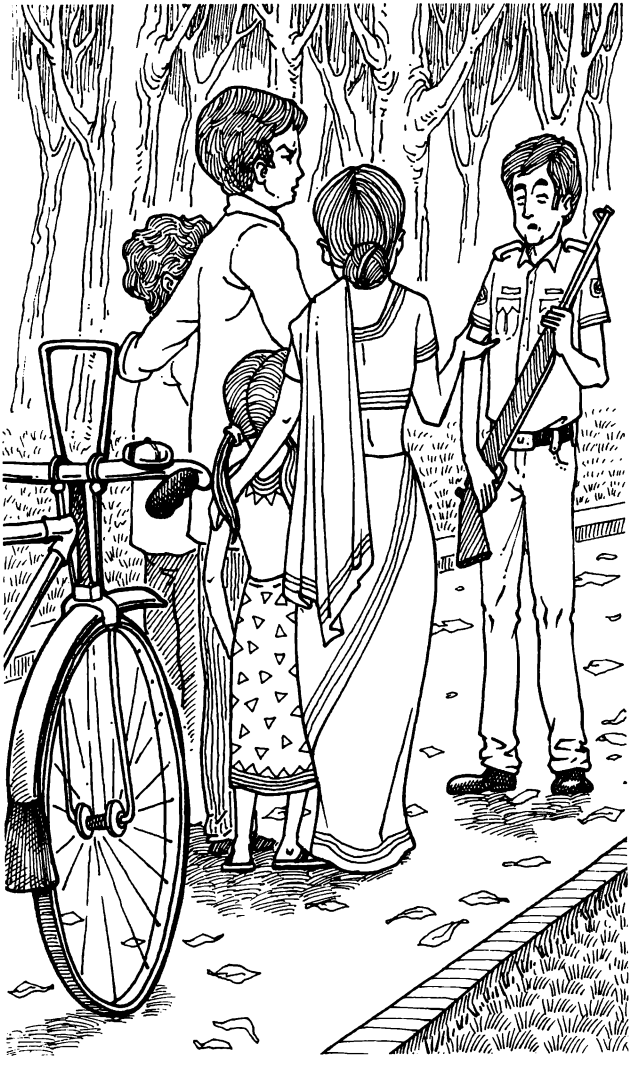

আব্বু মাথা নাড়লেন, "জি, সমস্যা। আমি আমার বাসায় যেতে পারছি না।"

"আপনার বাসা কোথায়?"

"এই রাস্তায়, এখান থেকে চারটা বাসার পর।"

পুলিশ অফিসার কেমন যেন ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল। বলল, "দোতলা বাসটা? সামনে নারকেল গাছ?"

"জি।"

পুলিশ অফিসার বলল, "মাই গড!"

আম্মু ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "কী হয়েছে?

পুলিশ অফিসার বলল, "আমরা কেউ জানি না কী হয়েছে ঐ বাসায়। টপ সিক্রেট। আমাদের ওপর দায়িত্ব প্রটেকশান দেওয়া। আপনাদের জন্যে কন্ট্রোল টিম অপেক্ষা করছে।

"কোথায়?"

"আপনাদের বাসার সামনে একটা ট্রেইলারে কন্ট্রোল সেন্টার তৈরি হয়েছে। সেখানে। চলেন আমাদের সাথে।"

আম্মু বললেন, "আমাদের জিনিসপত্র?"

"আমরা দেখব।" তারপর যে পুলিশটা তাদের আটকানোর চেষ্টা করছিল তাকে বলল, "এই মালপত্রগুলো দেখে রাখো। খবরদার যেন কিছু না হয়।"

"হবে না স্যার।"

ঠিক তারা যখন পুলিশ অফিসারের সাথে হাঁটতে শুরু করবে তখন অন্য-তিতুনি আব্বুর হাত ধরে বলল, "আব্বু।"

"কী হলো?"

"রিকশা ভাড়া।"

"ও, তাই তো।" তাড়াহুড়াতে আব্বু রিকশা ভাড়ার কথা ভুলেই যাচ্ছিলেন। বড় একটা নোট দিয়ে ভাংতির জন্যে আর অপেক্ষা করলেন না, পুলিশ অফিসারের সাথে হাঁটতে শুরু করলেন।

বাসার সামনে যাওয়ার আগে আরো কয়েকটা ব্যারিকেড পার হতে হলো। সবার শেষে দুজন মানুষ দাঁড়িয়েছিল, তারা পুলিশ

অফিসারটিকে থামাল। পুলিশ অফিসার বলল, "এই বাসাটিতে এই ফ্যামিলি থাকে।"

একজন মানুষ বলল, "ঠিক আছে, আমি দেখছি।" তারপর চারজনকে নিয়ে তারা ট্রেইলারের ভেতরে ঢুকে গেল।

আব্বু-আম্মু বা অন্য কেউ এর আগে কখনো এ রকম ট্রেইলারে ঢুকেননি। ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন। দেখতে একটা বাসার মতো কিন্তু এই বাসার প্রত্যেকটা স্কয়ার ইঞ্চি যন্ত্রপাতি দিয়ে ঠাসা। যন্ত্রপাতির নিজস্ব একটা শব্দ থাকে, সেই শব্দের জন্যে ভেতরে একটা বিচিত্র চাপা শব্দ। ট্রেইলারের ভেতরে বসার বিশেষ জায়গা নেই। এর মাঝে দুইজন বিদেশিসহ কয়েকজন বসেছিল, আব্বু-আম্মুকে বসানোর জন্যে দুইজন উঠে জায়গা করে দিল।

আব্বু-আম্মু কিংবা টোটন কিছুই বুঝতে পারছিল না। শুধু অন্য-তিতুনি পুরোটা জানে, তাকে ধরার জন্যে এই আয়োজন এবং সে নিজেই এখন তাদের সামনে বসে আছে। আব্বু বললেন, "এখানে কী হচ্ছে আমাদের একটু বলবেন?"

জিন্স এবং টি-শার্ট পরা মানুষটি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তখন টিশটাশ মেয়েটা বলল, "দাঁড়াও। এখানে দুজন বাচ্চা আছে তাদের সামনে কথা বলা কি ঠিক হবে?"

জিন্স-টি-শার্ট পরা ছেলেটা বলল, "আমার মনে হয় পুরো ফ্যামিলির সামনেই কথা বলা উচিত। ফ্যামিলির বড় মানুষদের থেকে হয়তো ছোটরাই আমাদেরকে বেশি ইনপুট দিতে পারবে।"

টিশটাশ মেয়েটা তখন বিদেশি দুইজনের সাথে কথা বলল, তারা আবার নিজেরা নিজেরা গুনগুন করে কিছুক্ষণ কথা বলল, তারপর মাথা নেড়ে সায় দিল। তখন জিন্স আর টি-শার্ট পরা ছেলেটা কথা বলতে শুরু করল। গলা পরিষ্কার করে বলল, "আমি শামীম। ডক্টর শামীম। মহাকাশ বিজ্ঞানে আমার পিএইচ.ডি আছে। আমি আই.এস.এ.এল.-এ কাজ করি। আই.এস.এ.এল. হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সার্চ ফর এলিয়েন লাইফ। আমাদের টিম লোকাল সাপোর্ট নিয়ে এখন

আপনাদের বাসাটাকে ঘিরে রেখেছে। মডার্ন টেকনোলজির সর্বোচ্চ ইলেকট্রনিক্স সার্ভেলেন্স দিয়ে আপনাদের বাসাটা ট্র্যাক করা হচ্ছে।"

আব্বু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

"আমরা সন্দেহ করছি আপনাদের বাসায় এই মুহূর্তে একটা এলিয়েন লাইফ ফর্ম ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

আব্বু-আম্মু এবং টোটন একসাথে চিৎকার করে উঠল এবং চিৎকার করতেই থাকল। শুধু অন্য-তিতুনি চুপচাপ বসে থেকে সবার মুখভঙ্গি একধরনের কৌতূহল নিয়ে দেখতে থাকল।

জিন্স-টি-শার্ট পরা শামীম অন্য-তিতুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "খুকি–"

"আমার নাম তিতুনি।"

"তিতুনি, তুমি বুঝতে পেরেছ আমরা কি বলেছি? আমরা বলেছি যে তোমাদের বাসায়–"

অন্য-তিতুনি বলল, "আপনারা কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি। আপনারা বলেছেন আমাদের বাসায় একটা এলিয়েন আছে।"

টিশটাশ মেয়েটা বলল, "খবরটা শুনে তুমি একটুও অবাক হলে না, তাই ভেবেছিলাম তুমি বুঝতে পারোনি।"

অন্য-তিতুনি বলল, "আমি অবাক হই নাই কারণ আমি এটা আগে থেকে জানি। এই এলিয়েন তিন দিন থেকে আমার সাথে থাকে।"

ঘরের ভেতরে একটা বোমা ফেললেও কেউ এত অবাক হতো না। একসাথে সবাই চিৎকার করে উঠল। বিদেশি দুইজন অন্য-তিতুনির কথা বুঝতে পারেনি বলে তাদেরকে কথাটা অনুবাদ করে দিতে হলো, তখন তারা দুইজন সবার চাইতে জোরে চিৎকার করে উঠল। সবাই অন্য-তিতুনিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যায়। সবাই একসাথে কথা বলতে থাকে, সবাই কিছু না কিছু প্রশ্ন করে। বিদেশি দুইজনও গলার ভেতর থেকে ঘর্ঘর ধরনের একটা শব্দ করে অন্য-তিতুনিকে কী যেন জিজ্ঞেস করল। অন্য-তিতুনি কারো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আম্মুর দিকে তাকাল, আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কী বলছিস এসব?"

অন্য-তিতুনি বলল, "সত্যি আম্মু । খোদার কসম।"

আবার সবাই প্রশ্ন করতে থাকে। অন্য-তিতুনি কারো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আবার আম্মুর দিকে তাকাল, আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "এত বড় একটা ব্যাপার, আমাদেরকে কিছু বললি না?"

অন্য-তিতুনি মাথা চুলকে বলল, "আমি ভাবছিলাম তোমাদেরকে বলব, কিন্তু তোমরা ব্যাপারটা কীভাবে নাও, কী মনে করো বুঝতে পারি নাই।"

"কী মনে করি মানে? মনে করার কী আছে?"

অন্য-তিতুনি বলল, "আসলে হয়েছে কী জানো, এই এলিয়েনটা বাসার পিছনে ল্যান্ড করেছে। মনে আছে সেদিন ভূমিকম্পের মতো হলো? আমি তখন এটাকে ল্যান্ড করতে দেখেছি। আমাদের বাসার পিছনের জঙ্গলে ল্যান্ড করেছে, আমি ভেবেছিলাম উল্কা। গিয়ে দেখি মাটিতে একটা গর্ত, আমি যখন গর্তটার দিকে তাকিয়েছিলাম তখন গর্তের ভেতর থেকে এলিয়েনটা বের হয়ে এলো।"

সবাই একটা আর্তচিৎকার করে উঠল। টোটন জিজ্ঞেস করল, "তুই ভয় পাসনি?"

অন্য-তিতুনি বলল, "নাহ্।"

"কেন ভয় পাসনি?"

"আমি ভয় পাই নাই, কারণ এলিয়েনটা দেখতে আমার মতো।"

সবাই একসাথে চিৎকার করে উঠল, "তোমার মতো?"

"হ্যাঁ। হুবহু আমার মতো। দেখতে আমার মতো, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি সব কিছু আমার মতো। প্রথমে আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম কিন্তু আস্তে আস্তে তার সাথে একটু খাতির হলো, তখন তার জন্য একটু মায়া হলো, তখন আমি আমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছি।"

টোটন তখন চিৎকার করে বলল, "মনে আছে আব্বু, আম্মু? আমি তিতুনির ঘরে আরেকটা তিতুনি দেখেছিলাম? মনে আছে? তার মানে আমি এলিয়েনটাকে দেখেছিলাম!"

অন্য-তিতুনি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। যখন তোমরা সবাই ভেতরে খুঁজতে গেছ তখন এলিয়েনটা সিলিং ফ্যানের পাখাটার উপর বসে ছিল, সে জন্যে কেউ খুঁজে পায় নাই।"

বিদেশি দুইজন যেহেতু অন্য-তিতুনির কথা বুঝতে পারছিল না তাই তাকে সব কথা অনুবাদ করে শোনানো হচ্ছিল। তারা টিশটাশ মেয়েটিকে দিয়ে অনেক রকম প্রশ্ন করে যাচ্ছিল কিন্তু অন্য-তিতুনি কথাবার্তা বলছিল আম্মু, আব্বু আর টোটনের সাথে।

আম্মু বললেন, "তার মানে মাঝরাতে যে ফ্রিজ খুলে খাচ্ছিল সেটি এলিয়েন?"

অন্য-তিতুনি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ আম্মু। ঠিক আমার মতো হয়েছে বলে তার মানুষের মতো খিদে পায়।"

আম্মু বললেন, "ওমা! সে তো একেবারে তোর মতো। আসলে তোর মতো না, আসলে তুই।"

"হ্যাঁ মা! আরেকজন আমি।"

"তুই আমাকে একবার বললি না? বেচারি কোথা থেকে এসে একা একা এই পৃথিবীতে কত না জানি মন খারাপ করেছে। পৃথিবীর মানুষ নিয়ে একটা ভুল ধারণা নিয়ে যাবে না? ভাববে যে এখানে কারো ভেতরে কোনো মায়া নেই?"

বিদেশি দুইজন এবং তার সাথে সাথে তাদের টিমের সবাই এতক্ষণে একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল, এবারে রীতিমতো জোর করে তারা অন্য-তিতুনির সাথে কথা বলার চেষ্টা করল। জিন্স, টি-শার্ট পরা শামীম বেশ গলা উঁচিয়ে বলল, "তিতুনি, তুমি আগে আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও।"

অন্য-তিতুনি ঘুরে এবারে তার দিকে তাকাল, বলল, "কী প্রশ্ন?"

শামীম কঠিন মুখে জিজ্ঞেস করল, "তুমি ঠিক ঠিক বলছ যে এলিয়েনটা দেখতে একেবারে হুবহু তোমার মতো?"

অন্য-তিতুনির একটু হাসি পেয়ে গেল, বলল, "আমি এই মাত্র আমার আম্মুকে সেটা বলেছি, আপনি শুনেননি?"

শামীম একটু থতমত খেয়ে বলল, "হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই নিশ্চিত হতে চাচ্ছি।"

টিশটাশ মেয়েটা বলল, "আমি ডক্টর নাহার। আমি ইন্টেলিজেন্ট লাইফ ফর্মের বিহেভিয়ার নিয়ে কাজ করি। আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।"

অন্য-তিতুনি বলল, "বলেন।"

"তুমি দাবি করছ এলিয়েন লাইফ ফর্মটা দেখতে হুবহু তোমার মতো। সেটার ব্যবহার, কথাবার্তা, অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তাও কি তোমার মতো?"

"হ্যাঁ আমার মতো।"

শামীম বলল, "এটা খুবই ইম্পরট্যান্ট। এলিয়েন সায়েন্সের অনেক বড় একটা থিসিস হচ্ছে, যদি তারা পৃথিবীতে এসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চায় তাহলে তারা মানুষের ফর্ম নিবে। তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সেটা কনফার্ম হবে।"

চাঁছা-ছোলা মাথার বিদেশিটা কী একটা বলল, টিশটাশ নাহার সেটা তিতুনিকে জিজ্ঞেস করল, বলল, "এলিয়েন এক্সপেডিশনের ডিরেক্টর প্রফেসর রিক গার্নার জানতে চাইছেন এই এলিয়েনের কি কোনো বাড়তি ক্ষমতা আছে?"

অন্য-তিতুনি বলল, "মনে হয় আছে।"

"কী রকম ক্ষমতা?"

"আমার সাথে যখন থাকে তখন তো আর ক্ষমতা দেখাতে হয় না। কিন্তু মনে করেন হঠাৎ করে আম্মু ঘরে ঢুকে গেলে সে এত তাড়াতাড়ি সরে যায় যে আম্মু দেখতে পান না। কিংবা মনে করেন, রাত্রে যখন বাসায় আসে তখন দোতলার জানালা দিয়ে শিক বাঁকা করে ঢুকে যায়।"

ন্যাড়া মাথা গার্নার আবার কিছু একটা বলল, ড. নাহার আবার অন্য-তিতুনিকে বলল, "এটা তো শারীরিক ক্ষমতা। মানসিক ক্ষমতা কী আছে?"

অন্য-তিতুনি বলল, "নিশ্চয়ই আছে। সে আমার মতো কথা বলে, চিন্তা করে, মানসিক ক্ষমতা না থাকলে কেমন করে সেটা সম্ভব?"

ন্যাড়া মাথা বিদেশি তখন পাকা চুল বিদেশির সাথে বেশ কিছুক্ষণ গুজগুজ-ফুসফুস করে কথা বলল। তারপর নাহার আর শামীমের সাথে কথা বলল। নাহার আর শামীম তখন অন্য-তিতুনির সাথে কথা বলতে এলো, অন্য-তিতুনি তখন হাত-পা নেড়ে আব্বু-আম্মু আর টোটনের সাথে এলিয়েনের কাজকর্মের একটা বর্ণনা দিচ্ছিল। শামীম আর নাহার গল্পটা শেষ করার সময় দিল, তারপর বলল, "তিতুনি, আমরা কি তোমার সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি?"

অন্য-তিতুনি বলল, "জি বলেন।"

নাহার বলল, "আমরা পৃথিবীর মানুষেরা এখন একটা যুগান্তকারী মুহূর্তের সামনে আছি। এই প্রথমবার পৃথিবীর মানুষ একটা এলিয়েনের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পেয়েছে। একটা এলিয়েনের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করা উচিত সেগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেক আলোচনা হয়েছে কিন্তু কেউ সেটা সঠিকভাবে জানে না। কিন্তু আমরা অসম্ভব সৌভাগ্যবান যে তোমার সাথে একজন এলিয়েনের যোগাযোগ হয়েছে এবং তুমি যদি আমাদের সাহায্য করো তাহলে পৃথিবীর মানুষেরা প্রথমবার একটা এলিয়েনের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। এখন তিতুনি, তুমি কি আমাদের সাহায্যটুকু করবে?"

"কী রকম সাহায্য?"

এবারে শামীম বলল, "মনে করো এলিয়েনটাকে রাজি করিয়ে তুমি কি তাকে এই ট্রেইলারে নিয়ে আসতে পারবে?"

অন্য-তিতুনি একটু সন্দেহের চোখে দুইজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এলিয়েনকে আনার পর আপনারা কী করবেন? তাকে কি ধরে ফেলবেন? কাটাকুটি করবেন?"

দুইজন একসাথে চিৎকার করে বলল, "না না। মোটেও কাটাকুটি করব না। কাটাকুটি কেন করব? আমরা একটু কথা বলব। কয়েকটা টেস্ট করব। কিছু স্যাম্পল নেব, কিছু ছবি তুলব, স্ক্যানিং করব। এ রকম রুটিন কাজকর্ম।"

অন্য-তিতুনি পরিষ্কার শুনতে পেল মনে মনে তারা বলছে, কোনোমতে এই ট্রেইলারে আনতে পারলেই এলিয়েনটাকে আটকে ফেলা যাবে। একবার আটকে ফেললে তাকে কাটাকুটি করতে সমস্যা কী? মুখে বলছে অন্য কথা। কত বড় বদমাইস!

অন্য-তিতুনি আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কথা দিচ্ছেন তার কোনো ক্ষতি করবেন না?"

সবগুলো মিথ্যুক মানুষ জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "অবশ্যই কথা দিচ্ছি।"

"দুইজন বিদেশি মানুষও কথা দিচ্ছেন? তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখেন।"

টিশটাশ ড. নাহার বলল, "জিজ্ঞেস করতে হবে না, আমি জানি তারাও কথা দিচ্ছেন।"

অন্য-তিতুনি সবার মনের কথা জানে তাই সে জোর করল, "না। আপনারা জিজ্ঞেস করে দেখেন। আমি তাদের নিজেদের মুখে শুনতে চাই। এই এলিয়েন বহু দূর গ্যালাক্সি থেকে এসেছে, আমি তাকে একটুও বিপদের মুখে ফেলব না।"

নাহার আর শামীম বিরক্ত মুখে তখন ন্যাড়া মাথা এবং পাকা চুলের দুই বিদেশির সাথে কথা বলল, তারা জোরে জোরে মাথা নেড়ে তাদের কথায় সায় দিল। নাহার বলল, "প্রফেসর রিক গার্নার আর প্রফেসর বব ক্লাইড কথা দিচ্ছেন।"

অন্য-তিতুনি তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে আমি তাহলে এলিয়েনকে ডেকে আনি।"

নাহার বলল, "যাও।" আমরা তোমার জন্যে এই ট্রেইলারে অপেক্ষা করছি।"

অন্য-তিতুনি ট্রেইলার থেকে বের হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের বাসার চারপাশে এত যন্ত্রপাতি লাগিয়েছে, এগুলো এলিয়েনের কোনো ক্ষতি করবে না তো?"

"না কোনো ক্ষতি করবে না। এগুলো লাগিয়েছি শুধুমাত্র মনিটর করার জন্য।"

অন্য-তিতুনির সাথে সাথে আব্বু, আম্মু আর টোটনও ট্রেইলারের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আম্মু খুশি খুশি গলায় বললেন, "যা, মেয়েটাকে ডেকে আন, আমরা দেখি।"

অন্য-তিতুনি বলল, "আম্মু, তুমি অনেকবার দেখেছ, শুধু বুঝতে পারোনি।"

"এবারে আমি বুঝে-শুনে দেখতে চাই।"

অন্য-তিতুনি বলল, "ঠিক আছে।" তারপর আব্বুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "আব্বু বাসার চাবিটা দাও।"

আব্বু পকেট থেকে বের করে চাবিটা এগিয়ে দিলেন। তিতুনি সেই চাবিটা নিয়ে বাসার দিকে হাঁটতে শুরু করে।

১৩

তিতুনি ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। দুপুরবেলার দিকে তাদের বাসার সামনে একটা ট্রেইলার এনে রাখা হয়েছে, তিতুনি আগে কখনো ট্রেইলার দেখেনি, এটা আসলে চাকা লাগানো একটা বাসা। এই ট্রেইলারের উপরে-নিচে, ডানে-বামে সব দিক দিয়ে নানা রকম যন্ত্রপাতি বের হয়ে আছে। ট্রেইলারের দরজা দিয়ে লোক ভেতরে ঢুকছে এবং বের হচ্ছে। একসময় সে দেখল তার আব্বু, আম্মু, টোটন আর এলিয়েন তিতুনি সেখানে ঢুকল। সে খুবই উত্তেজিত হয়ে কী হয় দেখার জন্যে তাকিয়ে রইল। যে এলিয়েন তিতুনিকে ধরার জন্য এত আয়োজন সেই এলিয়েন তিতুনি নিজেই এই ট্রেইলারে ঢুকেছে। তিতুনি অনেকক্ষণ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে জানালার পাশে ঘাপটি মেরে ট্রেইলারের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর তিতুনি দেখল এলিয়েন তিতুনি বেশ হেলতে-দুলতে ট্রেইলার থেকে বের হয়ে এলো। তার মানে এই মহা ধুরন্ধর এলিয়েন তিতুনি সবাইকে বোকা বানিয়ে রেখেছে। এত দুঃখের মাঝেও তিতুনির একটু হাসি পেয়ে গেল।

তিতুনি দেখল এলিয়েন তিতুনি বাসার চাবিটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বাসার দিকে আসছে, তার মতলবটা কী কে জানে? বাসার সিঁড়ি দিয়ে উঠে তালাটা খুলল, তারপর গলা উঁচু করে ডাকল, "তিতুনি।"

তিতুনি এক মুহূর্ত ইতস্তত করে উত্তর দিল, "কী হয়েছে?"

"তুমি বের হয়ে এসো।"

"কেন?"

"সবাই তোমার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

"কেন?"

"এরা আগে কখনো এলিয়েন দেখে নাই। এলিয়েন দেখতে চায়।"

তিতুনি প্রায় বলেই ফেলছিল, "এলিয়েন কী আমি না তুমি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল না, এই ধুরন্ধর মেয়েটার নিশ্চয়ই কোনো চালাকি আছে। বলল, "ঠিক আছে আসছি। জামাটা বদলে আসি।"

এলিয়েন তিতুনি বলল, "না না জামা বদলাতে হবে না। যেভাবে আছ সেভাবে বের হয়ে আসো। সবাই অপেক্ষা করছে। আব্বু, আম্মু আর টোটনও তোমাকে দেখতে চায়।"

মেয়েটার কথা শুনে তিতুনির পিত্তি জ্বলে যাওয়ার অবস্থা, তার নিজের আব্বু, আম্মু আর ভাই নাকি তাকে দেখতে চায়। একবার নিরিবিলি পেয়ে নিক তখন এই মেয়েটাকে সে বোঝাবে মজা।

যদিও এলিয়েন তিতুনি বলেছে যেভাবে আছে সেভাবেই যেন বের হয়ে আসে কিন্তু তিতুনি তারপরও চুলটা আঁচড়ে নিল, তার লাকি টি-শার্টটা পরে নিল (এই টি-শার্ট পরে থাকলে সাধারণত তার বিপদ-আপদ কম হয়)। বাসা থেকে বের হয়ে দেখল এলিয়েন তিতুনি সিঁড়ির উপর বসে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে ইচ্ছে করলেই বাসার ভেতরে ঢুকতে পারত, কিন্তু ঢুকেনি। এর পিছনে কোনো কারণ আছে কি না কে জানে।

তিতুনি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই এলিয়েন তিতুনি হাসি হাসি মুখে বলল, "দেখেছ, তোমাকে দেখার জন্যে সবাই কীভাবে অপেক্ষা করছে?"

"আমাকে দেখার জন্যে?"

"হ্যাঁ।" এলিয়েন তিতুনি হাত দিয়ে দেখাল, "কত যন্ত্রপাতি তোমার দিকে তাক করে রেখেছে দেখেছ?"

তিতুনি মাথা নাড়ল, এই মেয়েটা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে সে যেন কোনো বেফাঁস কথা বলে না ফেলে, এই যন্ত্রপাতি দিয়ে শুনে ফেলবে। তিতুনি তাই কোনো কথা বলল না। মুখ শক্ত করে

এলিয়েন তিতুনির দিকে তাকিয়ে রইল। এলিয়েন তিতুনি বলল, "চলো যাই।"

"চলো।"

তারা হেঁটে হেঁটে ট্রেইলারের দিকে যেতে থাকে। ট্রেইলারের দরজার কাছে আম্মু প্রায় ছুটে এসে তিতুনিকে ধরলেন, চোখ বড় বড় করে বললেন, "মা, তুই কোন দূর গ্রহ থেকে এসেছিস এখানে আমার বাসায়, একবার আমাকে সেই কথাটা বলবি না? তিতুনির বুদ্ধি শুনে শুনে তুই সারাক্ষণ ঘরের ভেতর লুকিয়ে থাকলি? কী খেয়েছিস, কোথায় ঘুমিয়েছিস কিছু জানি না মা–"

তিতুনির ইচ্ছে হলো বলে, "আম্মু, আমি মোটেও দূর গ্রহ থেকে আসিনি, আমি তোমার সত্যিকারের মেয়ে তিতুনি। যে ফাজিল মেয়েটাকে তুমি তোমার নিজের মেয়ে ভাবছ সে হচ্ছে ধুরন্ধর এলিয়েন, সবাইকে ঘোল খাওয়াচ্ছে"–কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর এই কথাগুলো বলা সম্ভব না, তাই মুখের মাঝে একটা এলিয়েন এলিয়েন ভাব ধরে রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

আব্বু গলা পরিষ্কার করে বললেন, "মা, তোমার কোনো কষ্ট হয়নি তো?" আব্বু সারা জীবন তিতুনিকে তুই করে বলে এসেছেন, এখন তুমি করে বলছেন। কপাল আর কাকে বলে। টোটন কোনো কথা না বলে চোখ বড় বড় করে তিতুনির দিকে তাকিয়ে রইল।

নাহার তখন তাদের তাড়া দিল, বলল, "সবাই ট্রেইলাইরের ভিতর চলে আসেন।"

আম্মু তিতুনির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কথা বলতে থাকলেন, বললেন, "কী আশ্চর্য মা, তুই কেমন করে হুবহু আমার মেয়ের মতো হয়ে গেলি? এক বিন্দু পার্থক্য নাই, ঘাড়ে তিলটা পর্যন্ত আছে।"

তিতুনি মনে মনে একটা নিঃশ্বাস ফেলল, সারা জীবন এই তিলটা ছিল, সেটি এখন কোথায় যাবে? আম্মুকে এই মুহূর্তে সেটা বোঝাবে কেমন করে?

ট্রেইলারের ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি চালু হয়ে গেল। বিচিত্র শব্দ করতে শুরু করল। শামীম তিতুনিকে

ট্রেইলারের এক কোনায় যন্ত্রপাতি দিয়ে বোঝাই একটা চেয়ার দেখিয়ে সেখানে বসতে বলল। তিতুনি মাথা ঘুরিয়ে এলিয়েন তিতুনির দিকে তাকাল, এলিয়েন তিতুনি সাথে সাথে বলল, "যাও। বসো চেয়ারটাতে। আমি সবার সাথে কথা বলে রেখেছি, কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।"

তিতুনি চেয়ারটাতে বসল, দেখে বোঝা যায় না কিন্তু চেয়ারটাতে বসতে খুব আরাম। আশেপাশে চারিদিকে নানা রকম যন্ত্রপাতি। শামীম উপর থেকে টেনে একটা হেলমেট নিচে নামিয়ে এনে তার মাথার মাঝে পরিয়ে দিল, সাথে বাইরের নানা ধরনের শব্দ কমে গিয়ে শুধু শোঁ শোঁ একটা শব্দ শুনতে পায়। চেয়ারের হাতলে তিতুনির দুটো হাত রাখা ছিল, দুটো যন্ত্র এসে হাত দুটোকে হাতলের সাথে আটকে ফেলল। তিতুনি টের পেল তার পা দুটোকেও একই কায়দায় আটকে দেয়া হয়েছে। বুকের উপর দুই পাশ থেকে দুটো চতুষ্কোণ যন্ত্র এসে আড়াআড়িভাবে তাকে আটকে ফেলেছে। তিতুনির বুকটা ধুকপুক করতে থাকে, এখান থেকে সে ছুটে বের হতে পারবে তো? সে নিজে বের হতে না পারলে এলিয়েন মেয়েটা নিশ্চয়ই তাকে বের করে নিবে।

তিতুনি টের পেল তার শরীরের সবকিছু পরীক্ষা করতে শুরু করেছে, হেডফোনে নানা ধরনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, চোখের সামনে নানা রঙের আলো খেলা করছে, শরীরের নানা জায়গায় আলাদা আলাদাভাবে কম্পন টের পাচ্ছে। মানুষগুলো নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের মাঝে বুঝে যাবে সে মোটেই এলিয়েন নয়, একজন খুবই ফালতু মানুষ, তখন তারা কী করবে?

তিতুনি দেখল বিদেশি মানুষ দুইজন অন্যদের সাথে কিছু একটা নিয়ে কথা বলছে, তখন তারা আব্বু-আম্মু আর অন্যদের কাছে এসে দাঁড়াল। নাহার বলল, "আমরা এখন এই এলিয়েন মেয়েটির উপর কিছু টেস্ট করব, এই সময়টাতে আপনাদের এই ট্রেইলারে থাকা ঠিক হবে না।"

আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

এলিয়েন তিতুনি জিজ্ঞেস করল, "টর্চার করবেন নাকি?"

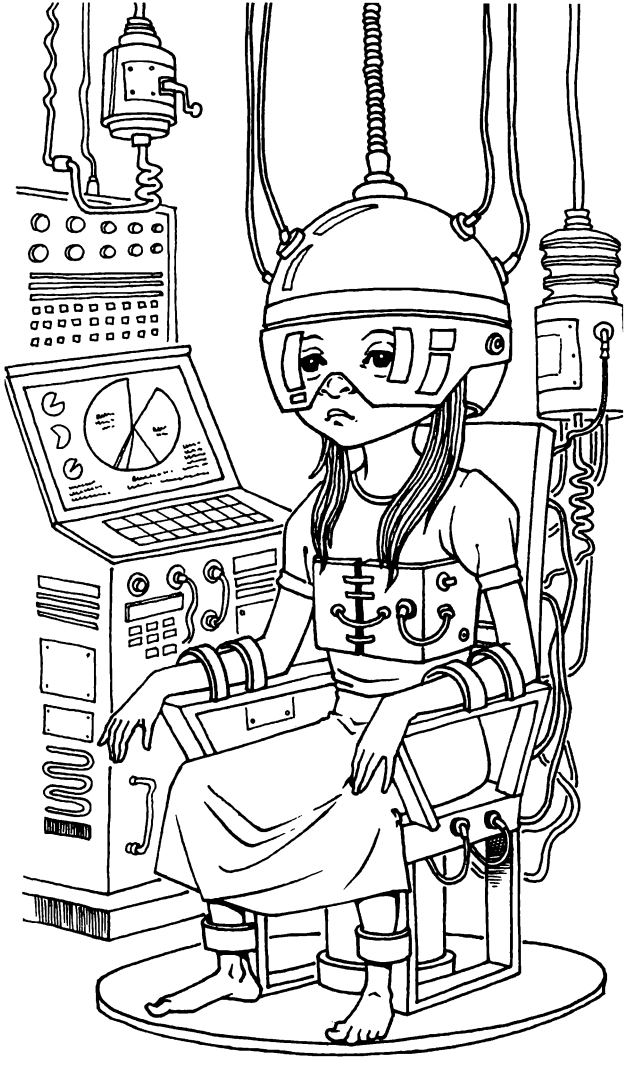

নাহার জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "না, না। টর্চার করব কেন? টেস্টগুলো করার সময় এলিয়েনের মনোযোগ এক জায়গায় থাকতে হবে। ট্রেইলারে পরিবারের সবাই থাকলে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।"

আম্মু জানতে চাইলেন, "কতক্ষণ টেস্ট করবেন?"

"আমরা তো চাইব ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। শুরুতে আধা ঘণ্টার একটা সেশান নেব।"

"আমরা বাসায় অপেক্ষা করি?"

শামীম বলল, "না। আপনারা বাসায় যেতে পারবেন না। আপনাদের বাসা কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছে।"

টোটন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কী করে রাখা হয়েছে?"

"কোয়ারেন্টাইন। কেউ যেতে-আসতে পারবে না। বাসা সিল করে দেয়া হয়েছে।"

আব্বু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমার সাথে কথা না বলে আমার বাসা সিল করে দেয়া হয়েছে মানে?"

শামীম মুখ শক্ত করে বলল, "এখানে যে টিম এসেছে তারা কত পাওয়ারফুল আপনারা বুঝতে পারছেন না। ড. গার্নার আর ড. ক্লাইডকে প্রোটেকশান দেওয়ার জন্য ইউএস মেরিনকে এয়ারলিফট করা হচ্ছে।"

আব্বু বললেন, "আমার সেটা জানার প্রয়োজন নাই। আমার বাসাকে সিল করে দেয়ার আগে আমার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন আছে। যখন আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।"

নাহার মুখ সুচালো করে বলল, "ড. গার্নার আর ড. ক্লাইডের ডিসিশান।"

এলিয়েন তিতুনি বলল, "ড. গার্নার আর ড. ক্লাইডের খেতা পুড়ি। তাই না আব্বু?"

আব্বু এলিয়েন তিতুনিকে ধমক দিয়ে বললেন, "তুই কেন বড়দের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছিস?"

আম্মু আব্বুকে বললেন, "এরা যখন চাইছে না আমরা এখানে থাকি তাই চলো আমরা বাইরে যাই।"

আব্বু বললেন, "বাইরে কোথায় যাব? জার্নি করে এসেছি, হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হওয়ার ব্যাপার আছে। বাচ্চারা কিছু খায়নি।"

নাহার বলল, "পাশে আরেকটা ট্রেইলার আছে, সেখানে বাথরুম আছে, স্ন্যাকস আছে, চা-কফি আছে, রেস্ট নেয়ার ব্যবস্থা আছে, দরকার হলে শুতেও পারবেন। আপনাদের সেখানে রেস্ট নেয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

জটিল যন্ত্রপাতি বোঝাই একটা চেয়ারে তিতুনিকে রীতিমতো বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে, সেখান থেকে তিতুনি করুণ চোখে আব্বু-আম্মু আর টোটনের দিকে তাকাল। এলিয়েন তিতুনি তার দিকে তাকিয়ে ছিল, তার মুখে একটা ফিচলে হাসি। তিতুনির মনে হলো এই হইচইয়ের মাঝেই সে সূক্ষ্মভাবে একবার চোখ টিপে দিয়েছে– সেটাই ভরসা। দরকার হলে এই ধুরন্ধর মেয়েটা নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার করবে।

ট্রেইলার থেকে বের হয়ে যখন আব্বু, আম্মু, টোটন আর এলিয়েন তিতুনি পাশের ট্রেইলারের দিকে যাচ্ছে তখন টোটন গলা নামিয়ে এলিয়েন তিতুনিকে বলল, "তিতুনি–"

"বলো ভাইয়া।

"আমি কি তোর সাথে একটু নিরিবিলি কথা বলতে পারি?"

"আমার সাথে?" এলিয়ে তিতুনি একটু অবাক হয়ে টোটনের দিকে তাকাল।

"হ্যাঁ। আয় আমাদের বাসার সিঁড়িতে গিয়ে বসি।"

"চলো।" তখন দুইজন হেঁটে হেঁটে গিয়ে তাদের সিঁড়িতে গিয়ে বসল। টোটন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল, তার আঙুলগুলো পরীক্ষা করে বলল, "এই যে পৃথিবীতে একটা এলিয়েন চলে এসেছে এইটা অনেক বড় একটা ঘটনা, চিন্তার বাইরের ঘটনা। তুই ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ সেটা জানত না। তুই নিশ্চয়ই খুব ভালো করে সবকিছু করেছিস, সে জন্যে এলিয়েনের সাথে তোর এত খাতির হয়েছে। এত বন্ধুত্ব হয়েছে।"

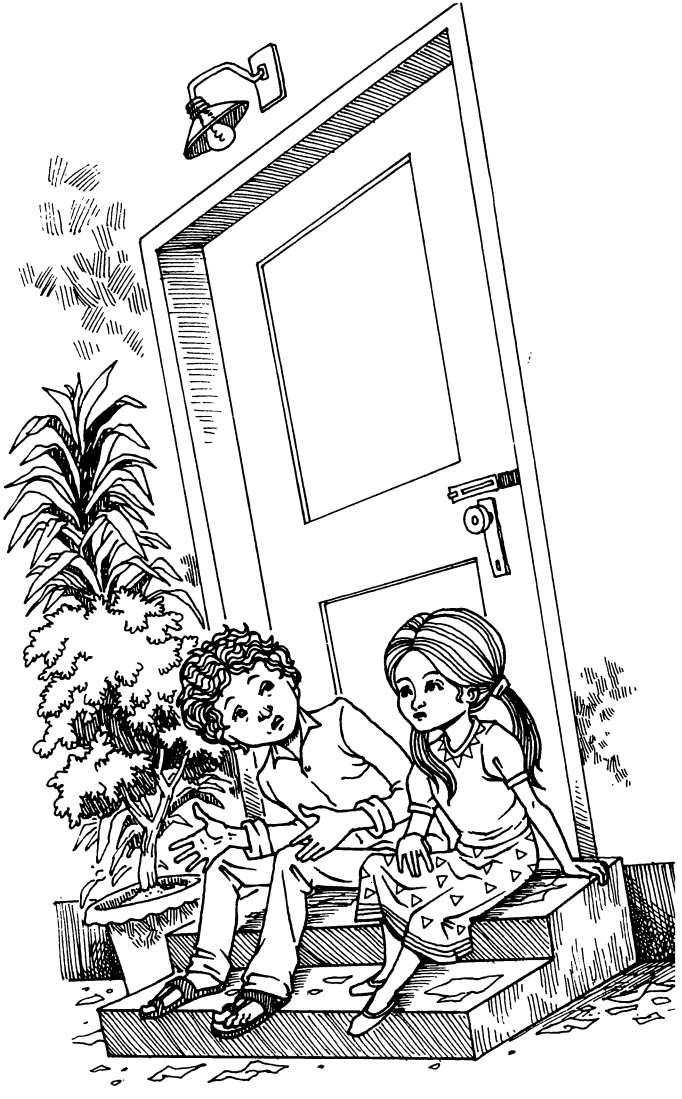

টোটন কয়েক সেকেন্ড থেমে আবার শুরু করল, "তুই একটা জিনিস লক্ষ করেছিস, গতকাল আমরা ঢাকা গিয়েছি, এই ট্রিপে অনেক কিছু ঘটেছে কোনোটাই ঠিক স্বাভাবিক না? পাগল ড্রাইভারের কারণে আমরা আরেকটু হলে মরেই যেতাম, মাইক্রোবাসটা রেললাইনে আটকে গিয়েছিল, একেবারে শেষ মুহূর্তে কী রকম হঠাৎ করে যেন ছুটে এলো। মনে আছে?"

অন্য-তিতুনি মাথা নাড়ল। টোটন বলল, "আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছিল কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে মাইক্রোবাসটা সরিয়ে দিয়েছে। যাই হোক, তারপর ধর ড্রাইভারের ব্যাপারটা। হঠাৎ করে সে ড্রাইভিং ভুলে গেল। এটা কি কখনো সম্ভব যে একজন মানুষের অন্য সব কিছু মনে আছে কিন্তু শুধু ড্রাইভিংটা ভুলে গেছে? দেখে কি মনে হয় না যে কেউ একজন তার মাথার ভেতরে ঢুকে শুধু ড্রাইভিংয়ের অংশটা মুছে দিয়েছে?"

অন্য-তিতুনি মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিল।

টোটন বলতে থাকল, "তারপর ধর সি.এন.জি. স্টেশনে সেই মানুষটার কথা। ডিম বিক্রি করা মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার পর তাকে আচ্ছামতন একটা শাস্তি দিল কে? অনেকগুলো কাক। এটা কি সম্ভব? সম্ভব না। কিছুতেই সম্ভব না। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি, আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। বুঝেছিস?"

অন্য-তিতুনি মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

টোটন কয়েক সেকেন্ড অন্য-তিতুনির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এরপর ধরা যাক বড় ফুপুর বাসার ঘটনা। পৃথিবীতে কেউ কখনো শুনেছে একটা কম্পিউটার গেম যখন খেলা হচ্ছে তখন খেলার মাঝখানে সেটা পাল্টে গিয়ে অন্য রকমভাবে খেলতে শুরু করেছে? সব গ্রাফিক্স পর্যন্ত বদলে গেছে? এটা কি কখনো সম্ভব? সম্ভব না, কিন্তু বড় ফুপুর বাসায় এটা ঘটেছে। আমাদের চোখের সামনে সেটা ঘটেছে। নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস না করে উপায় কী?"

টোটন এক সেকেন্ড থামল, তারপর কেমন যেন অপরাধীর মতো ভান করে বলল, "এর পরের ব্যাপারটা আমাদের করা উচিত হয়

নাই। তোকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আমরা প্ল্যান করে ডাইনিং টেবিলে তোর প্লেটে এক খাবলা লবণ দিয়ে দিলাম আর সেই লবণ সব হাজির হলো আমার প্লেটে। শুধু যে হাজির হলো তাই না–একশ' গুণ বেশি তিতা হয়ে হাজির হলো। কীভাবে হলো এটা?"

অন্য-তিতুনি কোনো কথা না বলে টোটনের দিকে তাকিয়ে রইল। টোটন চোখ সরিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আবার কথা শুরু করল, বলল, "এর পরের ঘটনাটা খুবই লজ্জার। চিন্তা করলেই লজ্জায় আমার শরীরের সব লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সেই কাজটা করার চেষ্টা করা আমাদের একেবারেই ঠিক হয় নাই। আমি, নাদু আর দিলু মিলে ঠিক করলাম রাত্রে তুই যখন ঘুমিয়ে থাকবি তখন আমরা তোর বিছানায় এক গ্লাস পানি ঢেলে দিব, যেন তুই বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছিস। আসলে হলো কী? ঘুমানোর আগে আমাদের তিনজনের পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেল। সে কী পানির তৃষ্ণা। এক গ্লাস না, দুই গ্লাস না–তিন তিন গ্লাস পানি খেয়ে তখন শান্তি। তারপর কী হলো? একজন না দুইজন না তিন তিনজন রীতিমতো বড় মানুষ একই সাথে বিছানায় পেশাব করে দিলাম। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা? এটা কি কখনো হতে পারে?"

অন্য-তিতুনি মাথা নাড়ল, স্বীকার করে নিল যে এটা হতে পারে না। টোটন তখন ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তুই দেখেছিস এইবার কতগুলি এইরকম অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে?"

অন্য-তিতুনি মাথা নাড়ল, বলল, "দেখেছি।" তারপর টোটনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখান থেকে তুমি কী বলতে চাইছ ভাইয়া?"

"আমি বলতে চাইছি–", টোটন মাথা চুলকে বলল, "আমি জানি কথাটা খুবই হাস্যকর শোনাবে, তবুও বলি। আমি বলতে চাইছি আসল তিতুনিকে বাসায় রেখে এলিয়েন তিতুনি আমাদের সাথে ঢাকা গিয়েছিল।"

অন্য-তিতুনির মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে, "মানে–"

"মানে তুই হচ্ছিস এলিয়েন। আর ট্রেইলারের ভিতর আসল তিতুনি এখন ভুজুংভাজুং করে সবাইকে বোকা বানাচ্ছে।"

অন্য-তিতুনি কিছুক্ষণ টোটনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাইয়া, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি আসলে এলিয়েন।"

টোটন কেমন যেন শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল, বলল, "আসলেই তুই–মানে তুমি–মানে আপনি–"

অন্য-তিতুনি হি হি করে হেসে বলল, "ভাইয়া, আমাকে তোমার আপনি করে বলতে হবে না। আমি আসলে একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তিতুনির কপি, বলতে পারো আগে একটা তিতুনি ছিল এখন দুইটা।"

টোটন কেমন যেন বিস্ফারিত চোখে অন্য-তিতুনির দিকে তাকিয়ে রইল, বলল, "তার মানে আসলে আমি বিছানায় পিশাব করি নাই–তুমি মানে তুই আমাকে পিশাব করিয়েছিস?"

"হ্যাঁ। আমি করিয়েছি।"

টোটন চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, "তার মানে অন্য একটা গ্যালাক্সি থেকে আসা একটা এলিয়েনের বড় কোনো কাজ নাই? তার কাজ হচ্ছে–"

অন্য-তিতুনি হি হি করে হেসে বলল, "ভাইয়া, তুমি একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ। এখানে আসার পর এলিয়েনটা আর এলিয়েন নাই, সে তিতুনি হয়ে গেছে। তিতুনির মতো দেখতে একটা প্রাণী না, পুরোপুরি তিতুনি। এখানে তিতুনির যে কাজ সেটা হয়ে গেছে এলিয়েনের কাজ। আসল তিতুনি অনেক কিছু পারে না, আমি পারি। এই হচ্ছে পার্থক্য।" কথা বলতে বলতে হঠাৎ এলিয়েন তিতুনি থেমে গেল। হাত তুলে বলল, "এক সেকেন্ড।"

"কী হয়েছে?"

"ট্রেইলারের ভেতরে ঐ ফাজিল মানুষগুলো তিতুনিকে একটা বাজে ইনজেকশান দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি ইনজেকশানটাকে নিউট্রালাইজ করে দিই।"

টোটন ভয়ে ভয়ে বলল, "কী ইনজেকশন?"

"ওরা বলছে ট্রুথ সিরাম। এটা দিলে মনের জোর ভেঙে যাবে, যেইটাই বলবে তিতুনিকে সেটাই করতে হবে। ফাজলেমি পেয়েছে?"

এক সেকেন্ড পরে এলিয়েন তিতুনি টোটনের দিকে তাকাল তারপর বলল, "হ্যাঁ, নিউট্রাল করে দিয়েছি। এখন বরং উল্টা কাজ হবে, তিতুনির ভেতরে কোনো ভয়-ডর থাকবে না।"

টোটন কেমন যেন হাঁ করে এলিয়েন তিতুনির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "কী আশ্চর্য। আমি একটা এলিয়েনের পাশে বসে আছি! এলিয়েন! সত্যিকারের এলিয়েন!"

এলিয়েন তিতুনি বলল, "এখন তুমি কী করবে? আমাকে ধরিয়ে দেবে?"

টোটন গলা উঁচিয়ে বলল, "ধরিয়ে দেব? ধরিয়ে দেব কেন? এইটা সত্যি এত দিন আমি তিতুনিকে কোনো পাত্তা দেই নাই, উঠতে-বসতে জ্বালিয়েছি। আর আমার এই বোকাসোকা বোনটা একটা এলিয়েনের সাথে খাতির করে সারা পৃথিবীর সবাইকে বোকা বানাচ্ছে, আর আমি তাকে ধরিয়ে দেব? তুই আমাকে তাই ভাবলি?"

এলিয়েন তিতুনি তখন কোনো কথা না বলে তার ডান হাতটা উপরে তুলল, টোটন তখন সেখানে একটা হাই ফাইভ দিল। প্রথমবার ভাই-বোনে বন্ধুত্ব হয়ে গেল, যদিও অরিজিনাল না তবুও তো ভাই-বোন।

টোটন কিছুক্ষণ একা একা বসে বসে হাসল, তারপর বলল, "তুই এখন কী করবি?"

এলিয়েন তিতুনি বলল, "চলে যাব।"

টোটন কেমন যেন চমকে উঠল, বলল, "চলে যাবি?"

"হ্যাঁ।"

"কেন? চলে যাবি কেন?"

"সব জানাজানি হয়ে গেছে, এখন আর থাকা যাবে না। এটা আমাদের নিয়ম, কোথাও গেলে সেখানে জানাজানি হতে পারবে না।"

"কিন্তু–", টোটন প্রায় হাহাকার করে বলল, "কোন গ্যালাক্সি থেকে এসে পৃথিবীর কিছুই দেখলি না জানলি না, আমার সাথে ঝগড়াঝাঁটি করে সময় কাটিয়ে দিলি–"

এলিয়েন তিতুনি বলল, "কে বলেছে কিছু দেখি নাই; এই পৃথিবীর সবচেয়ে দরকারি জিনিসগুলি জেনে গেছি।"

"কী দরকারি জিনিস?"

"এই যে মানুষ কীভাবে চিন্তা করে। একজন আরেকজনের সাথে ঝগড়া করে, আসলে ভেতরে ভেতরে ভালোবাসে। কোনো কারণ ছাড়া হি হি করে হাসে। কী অদ্ভুত!"

"কিন্তু পৃথিবীর কত রকম যন্ত্রপাতি কত আবিষ্কার--"

এলিয়েন তিতুনি বলল, "ধুর! এইগুলা কোনো আবিষ্কার নাকি? সব খেলনা। সেই খেলনা নিয়ে কী অহঙ্কার! ট্রেইলারের ভেতরে ছাগলগুলো ভাবছে তিতুনিকে আটকে ফেলে তার কাছ থেকে সবকিছু বের করে ফেলবে। এই কাঁচকলা।" বলে তিতুনি তার হাত দিয়ে কাঁচকলা বানিয়ে দেখাল।

টোটন বলল, "তুই চলে যাবি?"

"হ্যাঁ।"

"কখন?"

"এই তো কয়েক মিনিটের ভেতরে।"

টোটন চিৎকার করে উঠল, "কয়েক মিনিটের ভেতর?"

"হ্যাঁ, আমি আমার স্পেসশিপে যোগাযোগ করেছি। তারা ব্যবস্থা করছে।"

টোটন কেমন যেন অবাক হয়ে এলিয়েন তিতুনির দিকে তাকিয়ে রইল, প্রায় কান্না কান্না গলায় ফিসফিস করে বলল, "তুই চলে যাবি?"

"হ্যাঁ ভাইয়া। তিতুনি থাকবে, শুধু আমি চলে যাব। আমি তো আরেকটা তিতুনি ছাড়া কিছু না, সেই তিতুনি তো আছেই।"

১৪

শামীম তিতুনিকে বলল, "আমরা তোমার লাইফ ফর্মে সব রকম টেস্ট করেছি। তুমি যদিও এলিয়েন কিন্তু স্বীকার করতেই হবে তুমি মানুষের নিখুঁত রেপ্লিকা। আমরা এখনো কোনো বিচ্যুতি পাইনি। কাজেই আমরা একজন মানুষের সাথে যেভাবে যোগাযোগ করার কথা তোমার সাথে সেভাবে যোগাযোগ করছি।"

তিতুনি কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। এবারে নাহার বলল, "একজন এলিয়েন হয়ে তুমি যে হুবহু মানুষের একটা ফর্ম নিয়েছ সেটা একদিক দিয়ে আমাদের জন্যে ভালো অন্যদিক দিয়ে আমাদের জন্যে অনেক বড় সমস্যা।"

মাথাভরা পাকা চুল বিদেশিটা ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা বলল, নাহার মাথা নাড়ল, তারপর তিতুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "এলিয়েন হয়ে তুমি শুধু যে মানুষের ফর্ম নিয়েছ তা নয়, তুমি বারো বছরের একটা বাচ্চা মেয়ের ফর্ম নিয়েছ, শুধু যে শারীরিক ফর্ম তা নয়, তোমার মানসিক ফর্ম বারো বছরের, বুদ্ধিমত্তা বারো বছরের। তোমার সাথে যোগাযোগ করতে হলে বারো বছরের বাচ্চার সাথে যেভাবে কথা বলার কথা সেভাবে কথা বলতে হয়। এখন পর্যন্ত তোমার ভেতরে এলিয়েনসুলভ ক্ষমতার কোনো চিহ্ন আমরা পাইনি।"

তিতুনি মনে মনে বলল, "কেমন করে পাবে! আমি যদি এলিয়েন হতাম তাহলে না পেতে।" মুখে কোনো কথা না বলে মাছের মতো চোখে সবার দিকে তাকিয়ে রইল।

পাকা চুলের মানুষটা নাহারকে আবার কিছু একটা বলল, নাহার সেটা শুনে তিতুনিকে সেটা বোঝাতে থাকে, "প্রফেসর বব ক্লাইড

বলছেন তার ধারণা ছিল একজন এলিয়েন যখন মানুষের ফর্ম নেয় তখন বাইরের ফর্মটা নেয়। ভেতরের ফর্মটা ঠিক থাকে। তোমার বেলা সেটা পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি ইউনিভার্সাল ল্যাংগুয়েজ বোঝো না, সাইন ল্যাংগুয়েজ বোঝো না, ইংরেজি কিংবা ফ্রেঞ্চও বোঝো না। তোমার সাথে শুধু বাংলায় কথা বলতে হয়।"

শামীম বলল, "আমরা বাংলাতেই বলব কোনো সমস্যা নেই।"

এবারে ন্যাড়া মাথা মানুষটা কিছু একটা বলল, শামীম সেটা তিতুনিকে অনুবাদ করে শোনাল, "কিন্তু তুমি যেহেতু এলিয়েন, কাজেই এলিয়েনের নীলনকশা তোমার ভেতরে আছে। কোথাও না কোথাও কোড করা আছে। আমাদের সেটা দরকার।"

নাহার বলল, "আমরা তোমার শরীরের বাইরে থেকে স্যাম্পল নিয়েছি, এবারে ভেতর থেকে স্যাম্পল নেব। হার্ট কিডনি লিভার লাংস এবং ব্রেন টিস্যু।"

তিতুনি আঁতকে উঠল, বলে কী এরা? এখন তাকে কেটেকুটে ফেলবে? সে চোখ বড় বড় করে মানুষগুলোর দিকে তাকাল।

বিদেশিগুলো হড়বড় করে আরো কিছুক্ষণ কথা বলল, তারপর নাহার আর শামীম সেগুলো অনুবাদ করে শোনাতে লাগল। তারা বলল, "তোমার মস্তিষ্কের টিস্যু স্যাম্পল নেয়ার জন্যে তোমার খুলিতে ড্রিল করতে হবে, সত্যিকারের মানুষের বেলাতে কখনোই এ রকম একটা কিছু চেষ্টা করা হতো না–কিন্তু তুমি যেহেতু সত্যিকার মানুষ নও, তুমি যেহেতু একটা এলিয়েন, তোমার বেলায় এটা চেষ্টা করতে আইনগত কোনো বাধা নেই।

"তুমি যেহেতু বারো বছরের একটা শিশুর ফর্ম নিয়েছ তোমাকে অচেতন করেই আমাদের এই প্রক্রিয়াটা করা উচিত, কিন্তু আমরা তোমাকে অচেতন করব না দুটি কারণে। বিষয়টিতে যদি তুমি বাধা দিতে চাও তাহলে তোমাকে কোনো একধরনের এলিয়েন শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। আমরা সেটি দেখতে চাই, আমরা সেটি রেকর্ড করতে চাই।

"এছাড়াও দ্বিতীয় কারণটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কখনো ভাবিনি তোমাকে আমরা আটকে ফেলতে পারব। কিন্তু আমরা খুবই অবাক হয়ে লক্ষ করেছি আমরা আমাদের যন্ত্রপাতি দিয়ে তোমাকে আটকে ফেলতে পেরেছি। আমাদের আরো কিছু যন্ত্রপাতি আছে, আমরা তোমার উপর সেগুলো ব্যবহার করতে চাই। আশা করছি বিজ্ঞানের গবেষণায় আমরা তোমার সহায়তা পাব।"

কথা শেষ করে শামীম তার মাথায় লাগানো হেলমেটটার দিকে এগিয়ে গেল। তিতুনি হঠাৎ একধরনের আতঙ্ক অনুভব করে। সে ধরেই নিয়েছিল বিপদের সময় এলিয়েন তিতুনি তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু এরা তার মাথায় ড্রিল করতে চলে আসছে, এখনো এলিয়েন তিতুনির দেখা নেই, ব্যাপারটা কী? তিতুনি তখন গরম হয়ে বলল, "তুমি খালি আমার মাথায় ড্রিল করার চেষ্টা করে দেখো, আমি যদি তোমাদের ঠ্যাং ভেঙে না দেই–!"

তিতুনির কথাটা শেষ হবার আগেই খটাশ করে একটা শব্দ হলো আর ডক্টর শামীম দড়াম করে নিচে পড়ে গেল, নিজের পা ধরে তখন সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে। নাহার আর তার সাথে অন্যরাও তার কাছে ছুটে এলো, নাহার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

"পা, আমার পা!"

"কী হয়েছে তোমার পায়ের?"

"মনে হয় ভেঙে গেছে–মনে হয় এলিয়েনটা আমার পা ভেঙে দিয়েছে!"

তিতুনি অবাক হয়ে বলল, "আমি মোটেও তোমার পা ভাঙিনি–শুধু বলেছি ভেঙে দেব।"

শামীম তখন সাবধানে তার পা নাড়াল, তারপর ভাঙা গলায় বলল, "না ভাঙে নাই। কিন্তু আমার মনে হলো ভেঙে গেছে–খটাশ করে শব্দ হলো।"

বিদেশি দুইজন তখন শামীমের হাত ধরে তাকে দাঁড় করাল। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে শামীম ভয়ে ভয়ে তিতুনির দিকে

তাকাল। বিদেশি দুইজন তখন গলা নামিয়ে নিজেদের ভেতর কিছুক্ষণ কথা বলল, তারপর চোখের কোনা দিয়ে তিতুনিকে দেখল। তারপর নাহারকে বলল, "তুমি একটা সিরিঞ্জে করে দশ মিলিগ্রাম রিটাটিল নিয়ে এসো, আমি দেখতে চাই এই এলিয়েনটাকে অচেতন করা যায় কি না।"

নাহার ইতস্তত করে বলল, "কাজটা কি ঠিক হবে?"

বিদেশিগুলো বলল, "অবশ্যই ঠিক হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাঝে কোনো শর্টকাট নেই।"

তিতুনি বিদেশির কথাগুলো বুঝতে পারেনি কিন্তু তাদের ভাবভঙ্গি দেখে অনুমান করল তাকে নিয়ে তারা কিছু একটা আপত্তিকর কাজ করতে যাচ্ছে। সে চোখ পাকিয়ে বলল, "তোমরা কী করতে চাইছ?"

টিশটাশ ডক্টর নাহারকে এখন খুব টিশটাশ দেখাচ্ছে না, সে একটু ভয়ে ভয়ে বলল, "রিক গার্নার আর বব ক্লাইড তোমাকে অচেতন করার জন্য তোমার শরীরে রিটাটিল পুশ করার কথা চিন্তা করছেন।"

তিতুনি বলল, "তুমি এই বুড়া আর টাক্কুকে বলো কাজটা ভালো হবে না।"

"কেন? কেন ভালো হবে না?"

"আমি তাহলে তোমাদের সব যন্ত্রপাতি ভেঙে গুঁড়া করে দেব।"

তিতুনির কথা শেষ হবার আগেই ঠাস ঠাস শব্দ করে কয়েকটা মনিটর ফেটে গেল। দেওয়ালে লাগানো কয়েকটা যন্ত্র রীতিমতো বিস্ফোরণ করে সত্যি সত্যি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। ট্রেইলারের ভেতরে কালো ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধে ভরে যায়।

ড. নাহার বুকে হাত দিয়ে বলল, "হায় খোদা!"

বিদেশি দুইজন একজন আরেকজনের হাত ধরে বলল, "ও মাই গড!"

মানুষগুলোকে দেখে তিতুনির হাসি পেয়ে যায়, কিন্তু সে হাসল না। মুখ শক্ত করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। এলিয়েন তিতুনি তাকে ছেড়ে যায়নি–ট্রেইলারের বাইরের থেকেও ভেতরে কী হচ্ছে

সেটা লক্ষ করছে! সে যেটাই বলছে সেটাই করে ফেলছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে তাকে নিয়ে কোনো দুই নম্বরী কাজ করা চলবে না।

সবাই যখন ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে তখন ট্রেইলারের এক কোনা থেকে একজন ইংরেজিতে বলল, "খুব আজব একটা জিনিস হচ্ছে।"

ন্যাড়া মাথা রিক গার্নার শুকনো গলায় জানতে চাইল, "কী হচ্ছে?"

"যন্ত্রপাতিগুলো উল্টাপাল্টা কাজ করছে।"

"কী রকম উল্টাপাল্টা?"

"মনে হচ্ছে কমিউনিকেশান্স মডিউলে কোনো কন্ট্রোল নাই। পুরো ট্রেইলারের সব যন্ত্রপাতি থেকে পাওয়ার নিয়ে যাচ্ছে।"

"পাওয়ার নিয়ে কী করছে?"

"এন্টেনা দিয়ে একটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছে।"

"কী রকম সিগন্যাল?"

"মনে হচ্ছে কোনো একধরনের সংখ্যার সিকোয়েন্স।"

ট্রেইলারের সব যন্ত্রপাতি থেকে পাওয়ার নিয়ে নেবার কারণে যন্ত্রপাতিগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। ট্রেইলারের আলোও আস্তে আস্তে কমে কেমন জানি নিবু নিবু হয়ে আসে।

কে যেন জিজ্ঞেস করল, "কী হচ্ছে এখানে?"

মাথা ন্যাড়া বিদেশিটা বলল, "মনে হয় এলিয়েনটা আমাদের এন্টেনা দিয়ে তার মাদারশিপের সাথে যোগাযোগ করছে।"

যদিও বিদেশিদের উচ্চারণ আর কথা বুঝতে তিতুনির সমস্যা হচ্ছিল কিন্তু এই কথাটা সে বুঝতে পারল এবং বুঝে সে চমকে উঠল। এলিয়েন তিতুনি তার মাদারশিপের সাথে যোগাযোগ করছে, তাহলে কি সে এখন চলে যাবে? আগেই বলেছিল পৃথিবীতে সে যে এসেছে সেটা সে জানাজানি করতে চায় না। এখন সেটা জানাজানি হয়ে গেছে, এখন নিশ্চয়ই আর থাকবে না। নিশ্চয়ই চলে যাবে। কখন চলে যাবে? কীভাবে চলে যাবে? সে চলে যাবার পর তার কী হবে?

ঠিক তখন মনে হলো ট্রেইলারের বাইরে একটা বাজ পড়ল। প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল, বিজলির নীল আলোতে চারপাশ ঝলসে ওঠে। কোনো মেঘ নেই বৃষ্টি নেই কিন্তু তার মাঝে পরিষ্কার বজ্রপাত। বজ্রপাত হলে নীলাভ আলো একবার ঝলসে ওঠার পর শেষ হয়ে যায়, কিন্তু এবারে শেষ হলো না। নীল আলো ঝলসাতে লাগল আর বিচিত্র একধরনের শব্দ শোনা যেতে লাগল। ট্রেইলারের জানালা দিয়ে ভেতরে সেই আলো খেলা করতে থাকে।

ট্রেইলারের দরজা খুলে সবাই বাইরে তাকায় এবং তিতুনি শুনতে পেল, পাকা চুলের বিদেশিটা চিৎকার করে বলল, "ও মাই গুডনেস!"

কী দেখে বিদেশিটা চিৎকার করেছে তিতুনি দেখতে পাচ্ছিল না, তাকে যন্ত্রপাতি বোঝাই চেয়ারটাতে বেঁধে রেখেছে বলে সে নড়তেও পারছিল না। ট্রেইলারের দরজা দিয়ে বাইরের দৃশ্যটি দেখে সবাই আবার ভেতরে এসে তিতুনিকে ঘিরে দাঁড়াল। শামীম হিসহিস করে বলল, "তুমি এলিয়েন না। তুমি মানুষ। তুমি আমাদের ধোঁকা দিয়েছ।"

ওরা হঠাৎ করে সেটা কেমন করে বুঝতে পারল তিতুনি এখনো জানে না। কিন্তু বিষয়টা যখন জেনেই গিয়েছে তখন সেটা আর গোপন রাখার কোনো অর্থ হয় না। তিতুনি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমি মানুষ। অন্যজন এলিয়েন।"

"তুমি আমাদের সে কথাটা আগে কেন বলো নাই?"

"কেন বলব? তোমরা এত বড় বড় বৈজ্ঞানিক, তোমরা কেন নিজেরা সেটা বের করতে পারো না?"

নাহার প্রায় হিংস্র গলায় বলল, "তুমি মানুষ হয়ে মানুষের পক্ষে থাকলে না? তুমি মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এলিয়েনের পক্ষে গেলে?"

তিতুনি রেগে গিয়ে বলল, "হ্যাঁ গিয়েছি, আরো একশ'বার যাব।"

"কেন?"

"কারণ সে তোমার কাছে এলিয়েন। আমার কাছে মানুষ। খালি মানুষ না, সে পুরোপুরি আমি। আমি আমার পক্ষে থাকব না কি তোমার পক্ষে থাকব?"

নাহার কী বলবে বুঝতে পারছিল না, তিতুনি বলল, "এখন তো জেনে গেছ কে মানুষ কে এলিয়েন। সমস্যাটা কী?"

"দেরি হয়ে গেছে।"

তিতুনি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, "সে কি চলে গেছে?"

"না, এখনো যায়নি। কিন্তু সে একটা শক্তিবলয়ের মাঝে ঢুকে গেছে, তাকে আর আমরা ছুঁতে পারব না।"

তিতুনি তার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ওকে দেখব–কথা বলব।"

নাহার বিদেশি দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন এই মেয়েটাকে শুধু শুধু আটকে রেখে কী হবে? একে ছেড়ে দিই?"

ন্যাড়া মাথা বিদেশিটার মুখটা দেখতে দেখতে কেমন জানি নিষ্ঠুর হয়ে যায়। সে মাথা নাড়ল, বলল, "না। এখন এই মেয়েটা হচ্ছে আমাদের শেষ অস্ত্র। এই মেয়েটাকে ব্যবহার করে আমাদের শেষ চেষ্টা করতে হবে।"

"কীভাবে শেষ চেষ্টা করবে?"

"এটমিক ব্লাস্টার।"

নাহার আর শামীম একসাথে ভয় পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠল, "এটমিক ব্লাস্টার?"

"হ্যাঁ। এখন আর মেপে মেপে স্যাম্পল নেয়ার সময় নেই। এটমিক ব্লাস্টার দিকে এলিয়েনটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিব, তখন তার ছিন্নভিন্ন অংশটা হবে আমাদের স্যাম্পল।"

শামীম আর নাহার এমনভাবে ন্যাড়া মাথা বিদেশিটার দিকে তাকিয়ে রইল যে দেখে মনে হলো তারা তার কথা বুঝতে পারছে না। শামীম খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু এলিয়েনটা শক্তিবলয়ের

ভেতর ঢুকে গেছে, সেখানে যে পরিমাণ এনার্জি তোমার এটমিক ব্লাস্টারের স্প্লিন্টার তো ভেতরে ঢুকবে না।"

বিদেশিটা হিংস্র মুখে বলল, "তাকে শক্তিবলয়ের বাইরে আনতে হবে।"

"কীভাবে বাইরে আনবে?"

বিদেশিটা তিতুনিকে দেখিয়ে বলল, "এই নির্বোধ মেয়েটাকে দিয়ে।"

নাহার ইতস্তত করে বলল, "কীভাবে?"

ন্যাড়া মাথা রিক গার্নার বলল, "সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও।" তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, "এটমিক ব্লাস্টার বের করে পজিশান নাও। এলিয়েনটাকে লেজার লক করো। আর এই নির্বোধ মেয়েটাকে খুলে দাও।" কথা শেষ করে সে তার জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট কালো রিভলবার বের করে আনল। সেটা তিতুনির মাথার দিকে তাক করে বলল, "নির্বোধ মেয়ে, আমি আজকে তোমাকে জন্মের মতো শিক্ষা দিব। তোমার চৌদ্দ গুষ্টি সেটা মনে রাখবে।"

তিতুনিদের বাসার সামনে খোলা জায়গাটাতে এলিয়েন তিতুনি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ঘিরে একটা নীল আলো। সেই আলোটা মাটি থেকে শুরু করে একেবারে আকাশের দিকে উঠে গেছে। নীল আলো থেকে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলক বের হয়ে আসছে, একটা ভোঁতা শব্দ মাঝে মাঝে বাড়ছে মাঝে মাঝে কমছে। আলোটা যেখানে মাটিতে এসে নেমেছে সেই জায়গাটি আগুনের মতো গনগনে গরম, একধরনের পোড়া গন্ধে বাতাসটা ভারী হয়ে আছে। নীল আলোটি তীব্র নয়, কেউ বলে দেয়নি কিন্তু সবাই বুঝতে পারছে এই নীল আলোর মাঝে অচিন্তনীয় একধরনের শক্তি আটকা পড়ে আছে, সেই শক্তিটুকু এই এলিয়েন মেয়েটিকে রক্ষা করছে, পৃথিবীর কারো সাধ্যি নেই এখন তাকে স্পর্শ করে।

আব্বু আর আম্মু হতচকিতের মতো এলিয়েন তিতুনির দিকে তাকিয়ে ছিলেন, টোটন বুঝিয়ে দেবার পরও বুঝতে পারছিলেন না কেমন করে তাদের মেয়ে হঠাৎ এলিয়েন হয়ে গেল। তাহলে তাদের আসল মেয়ে এখন কোথায়? কেন সে ট্রেইলারের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে না? আম্মু একবার ট্রেইলারের দরজা দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করলেন, তারপর এলিয়েন তিতুনির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তিতুনি মা, তুই চলে যাচ্ছিস কেন? থেকে যা।"

টোটনও চিৎকার করে বলল, "হ্যাঁ। তিতুনি তুই থেকে যা। এই জীবনে তোকে আর কোনোদিন জ্বালাব না। খোদার কসম।"

আম্মু বললেন, "তুই তো পুরোপুরি তিতুনি। আমার যদি একটা তিতুনি থাকতে পারে তাহলে দুটি তিতুনি কেন থাকতে পারবে না?"

এলিয়েন তিতুনি নীল আলোর শক্তিবলয়ের ভেতর থেকে বলল, "আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে আমার ফিরে যেতে হবে, সেখানে সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাছাড়া–"

এলিয়েন তিতুনি একটু থামল, তারপর বলল, "তাছাড়া পৃথিবীর মানুষ ভালো যন্ত্র খুব বেশি তৈরি করতে পারেনি কিন্তু অনেকগুলি খুব খারাপ খারাপ যন্ত্র তৈরি করেছে। ঐ দেখো একটা খারাপ যন্ত্র বের করে আনছে আমাকে গুলি করার জন্য।"

সবাই মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, অবাক হয়ে দেখল, মেশিনগানের মতো একটা যন্ত্র টেনে নামিয়ে আনছে ট্রেইলারের ভেতর থেকে।

আম্মু-আব্বু চিৎকার করে উঠলেন, বললেন, "সর্বনাশ।"

এলিয়েন তিতুনি বলল, "না, আম্মু-আব্বু কোনো ভয় নেই। এই শক্তিবলয়ের ভেতরে আমাকে কিছু করতে পারবে না।" কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে সে দেখল ট্রেইলারের দরজা দিয়ে মাথা ন্যাড়া রিক গার্নার তিতুনির চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে বের করে আনছে, তার অন্য হাতে কুচকুচে কালো ছোট একটা রিভলবার। রিভলবারটি সে তিতুনির মাথায় ধরে রেখেছে। ট্রেইলারের দরজায় দাঁড়িয়ে সে হিংস্র গলায় চিৎকার করে ইংরেজিতে বলল, "সরে যাও সবাই, খবরদার। খুন করে ফেলব।"

আম্মু একটা আর্তচিৎকার করে ছুটে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু কোথা থেকে সামরিক পোশাক পরা একজন মানুষ এসে প্রথমে আম্মুকে তারপর আব্বুকে ধরে ফেলল।

পাকা চুলর মানুষটা এটমিক ব্লাস্টারটা তার তিনটা পায়ের উপর দাঁড়া করিয়ে সেটা চালু করে দিয়েছে। ভেতর থেকে একটা চাপা গুঞ্জনের সাথে সাথে লাল রঙের লেজারের আলো এলিয়েন তিতুনিকে আলোকিত করে ফেলে। পাকা চুলের বব ক্লাইড চিৎকার করে বলল, "লক ইন কমপ্লিট। গেট রেডি।"

ন্যাড়া মাথার মানুষটা তিতুনির চুলের মুঠি ধরে ট্রেইলারের সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে নিচে নেমে আসে। তিতুনির চোখে-মুখে একটা অবর্ণনীয় আতঙ্ক। চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকুনি দিতেই তার মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ পড়ল। ন্যাড়া মাথা রিক গার্নার হুংকার দিয়ে বলল, "ইউ ব্লাডি এলিয়েন। দ্যাখ তোর মানুষ বন্ধুর কী অবস্থা। তোর সাথে দেখা হয়েছিল বলে সে এখন তোর সামনে খুন হয়ে যাবে।"

আম্মু চিলের মতো একটা চিৎকার করলেন, তাকে ধরে রাখা মানুষটা সাথে সাথে খপ করে আম্মুর মুখ চেপে ধরল।

ন্যাড়া মাথা রিক গার্নার রিভলবারটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "আমি এই নির্বোধ মেয়েকে খুন করে ফেলব, নর্দমার কীট, পারলে তুই তাকে রক্ষা কর।"

নীল আলোর ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা এলিয়েন তিতুনি স্থির দৃষ্টিতে রিক গার্নারের দিকে তাকিয়ে রইল। তিতুনিকে বাঁচানোর জন্যে এই শক্তিবলয় থেকে বের হলেই এটমিক ব্লাস্টার দিয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। পৃথিবীর মানুষ কত যত্ন করে, কত নিখুঁতভাবে ধ্বংস করার জন্যে কত রকম যন্ত্র তৈরি করেছে।

রিক গার্নার চিৎকার করে বলল, "নরকের কীট, আমি তিন পর্যন্ত গুনব, তারপর গুলি করে এই নির্বোধ মেয়ের খুলি উড়িয়ে দেব।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে সে চিৎকার করে গুনল, "ওয়ান", এক সেকেন্ড

অপেক্ষা করে বলল, "টু, তারপর দুই সেকেন্ড অপেক্ষা করে বলল, থ্রি"–তারপর ট্রিগার টেনে তিতুনির মাথায় গুলি করে দিল।

তিতুনির সামনে সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যায়, চারপাশে অনেক মানুষ, তাদের চিৎকার, তার চুলের মুঠি ধরে রাখা রিক গার্নার, মাথার মাঝে রিভলবারের কালো নল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আম্মু, আব্বু, টোটন– তাদের আতঙ্কিত দৃষ্টি। বাসার সামনে আকাশ থেকে নেমে আসা নীল আলোর একটা টানেল, সেই টানেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এলিয়েন মেয়েটি, বাতাসে তার চুল উড়ছে, তার চোখ দুটো স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষের চিৎকার, কোলাহল, যন্ত্রের ভোঁতা শব্দ, পোড়া গন্ধ, সবকিছু হঠাৎ থেমে গেল। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই।

তিতুনি খুব ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকাল, চারপাশ পুরোপুরি নৈঃশব্দে ঢেকে যাওয়া একটা পৃথিবী, তার মাঝে সবকিছু একটা ছবির মতো স্থির হয়ে আছে, আর সেই ছবির দৃশ্যের মাঝে ঢেউয়ের মতো ভেসে ভেসে আসছে এলিয়েন মেয়েটি। মনে হচ্ছে যোজন যোজন সময় পরে এলিয়েন মেয়েটি তার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করল। তার খুব কাছে এসে তার কপালে কপালে ছুঁইয়ে তার চোখের দিকে তাকাল। তিতুনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "আমি কী মরে গেছি?"

"না।" এলিয়েন মেয়েটি মাথা নাড়ল, "না তিতুনি, তুমি মরে যাওনি।"

"তাহলে আমার চারপাশে এ রকম কেন? কোনো শব্দ নেই কেন? সবাই ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন?"

"তোমাকে বাঁচানোর জন্যে আমি সময়কে স্থির করে দিয়েছি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।" এলিয়েন মেয়েটি তার চুল ধরে থাকা ড. মর্গানের হাতটা সরিয়ে তাকে মুক্ত করে। রিভলবারের নল থেকে তাঁর মাথাটা সরিয়ে আনে। তারপর বলল, "এই দেখো রিভলবার থেকে

বুলেট বের হয়ে তোমার মাথায় আঘাত করতে যাচ্ছিল, মাঝপথে থেমে গেছে।"

তিতুনি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কী অবাক লাগছে দেখতে!

এলিয়েন তিতুনি সাবধানে শূন্যে ঝুলে থাকা বুলেটটা ধরে তিতুনির হাতে দেয়, বলো, "নাও। দেখো এখনো গরম হয়ে আছে। আরেকটু হলে এটা তোমার মাথায় ঢুকে যেত।"

তিতুনি এলিয়েনের দিকে তাকিয়ে বলল, "থ্যাংকু, আমাকে বাঁচানোর জন্যে।"

এলিয়েন মেয়েটি হাসল, বলল, "যখন আমি থাকব না, তখন নিজেকে দেখে-শুনে রেখো।"

"রাখব।"

তিতুনি অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাল, চারপাশে সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আম্মুর মুখে অবর্ণনীয় আতঙ্ক, আব্বু ভয়ে চোখ বন্ধ করে আছেন, টোটনের চোখে-মুখে অবিশ্বাস। সবাই মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

রিক গার্নারের মুখে হিংস্র একটা ভঙ্গি, চোখগুলো লাল, মুখের ফাঁক দিয়ে জিভ বের হয়ে আছে। বব ক্লাইডের মুখ কুঁচকে আছে, এটমিক ব্লাস্টারটা দুই হাতে ধরে রেখেছে। এদিকে-সেদিকে অনেক মানুষ, সবাই বিচিত্র ভঙ্গিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এলিয়েন মেয়েটি চারিদিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার এখন যেতে হবে তিতুনি।"

তিতুনির চোখে হঠাৎ পানি এসে গেল, বলল, "তুমি চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে।"

এলিয়েন বলল, "হবে না। যাবার আগে আমি তোমার স্মৃতি মুছে দিয়ে যাব। সবার স্মৃতি মুছে দিয়ে যাব।"

তিতুনি বলল, "না, প্লিজ না। আমার স্মৃতি মুছে দিও না। আমি তোমাকে মনে রাখতে চাই।"

এলিয়েন মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, "না, তিতুনি এটা হয় না। আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে কখনো কোনোদিন এই নিয়ম

ভাঙা হয়নি, তুমি আমাকে এই অনুরোধ করো না। আমাকে সবার সব স্মৃতি মুছে দিতে হবে।"

তিতুনি প্রায় হাহাকারের মতো শব্দ করে বলল, "প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ–তুমি আমার স্মৃতি মুছে দিও না। আমি তোমাকে মনে রাখতে চাই।"

এলিয়েন মেয়েটি তিতুনির হাত ধরে বলল, "আমাকে বিদায় দাও তিতুনি। আমি যাই।"

তিতুনি মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল। গালে ঠোঁট স্পর্শ করল, চুলে হাত বুলিয়ে দিল, তারপর চোখ মুছে বলল, "বিদায়। তুমি যেখানেই থাকো ভালো থেকো।"

এলিয়েন মেয়েটি তিতুনির হাত ছেড়ে দিয়ে নীল আলোটার দিকে এগিয়ে যায়। কাছাকাছি পৌঁছে সে একবার ঘুরে তাকাল, হাত নাড়ল। তিতুনি অবাক হয়ে দেখল এলিয়েন মেয়েটির চোখের নিচে চিকচিক করছে পানি।

এলিয়েন মেয়েটি তারপর নীল আলোর বলয়ের ভেতরে ঢুকে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে দুই হাত ধীরে ধীরে দুই পাশে ছড়িয়ে দেয়–তার শরীর তখন ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে শরীরটা হঠাৎ উপরে উঠতে থাকে, দেখতে দেখতে সেটি নীল আলোর টানেলের ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে ছুটে যেতে থাকে। দেখতে দেখতে সেটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তিতুনি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে–তাকিয়েই থাকে।

হঠাৎ করে তিতুনি শুনতে পেল টোটন তাকে জিজ্ঞেস করল, "এই তিতুনি, তুই এ রকম হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছিস কেন?"

তিতুনি মাথা নামিয়ে আনে। একটু আগে মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো নড়তে শুরু করেছে। আম্মু আর আব্বু তার

দিকে এগিয়ে এসেছেন, আম্মু চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো দেখিয়ে আব্বুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে এত মানুষ কেন?"

তাদের কারো কিছু মনে নেই।

আব্বু বললেন, "বুঝতে পারছি না। দেখি কাউকে জিজ্ঞেস করে।"

তিতুনি দেখল আব্বু শামীমের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কী হয়েছে? এত মানুষ কেন? এত যন্ত্রপাতি কেন?"

শামীম মাথা চুলকে বলল, "ঠিক বলতে পারছি না। আমরা এলিয়েন লাইফ ফর্ম খুঁজি, হয়তো এখানে সে রকম সিগন্যাল ছিল। দেখি আমি আমাদের টিম লিডারকে জিজ্ঞেস করি।"

তিতুনি দেখল শামীম রিক গার্নারের কাছে গিয়ে তাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করল। রিক গার্নার শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ শামীমের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর হঠাৎ মুখ বিকৃত করে একটা হিংস্র পশুর মতো শব্দ করল।

শামীম লাফ দিয়ে পিছনে সরে গিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "নাহার, প্রফেসর গার্নারের কী হয়েছে? এ রকম করছে কেন?"

নাহার বলল, "বুঝতে পারছি না। প্রফেসর ক্লাইডও খুব বিচিত্র ব্যবহার করছেন। কথা না বলে কেমন জানি শব্দ করছেন। জন্তুর মতো শব্দ।"

তিতুনি দেখল আব্বু তাদের কাছ থেকে সরে আসছেন, সবাই মিলে রিক গার্নার আর বব ক্লাইডকে ধরে ট্রেইলারের ভিতর নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ দুটো হিংস্র পশুর মতো শব্দ করে যাচ্ছে।

এলিয়েন মেয়েটি যাবার সময় রিক গার্নার আর বব ক্লাইডের সব স্মৃতি শুধু মুছে দেয়নি, তাদের মস্তিষ্কটি তাদের উপযুক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছে, হিংস্র পশুর মতো। তাদের যে রকম হবার কথা।

তিতুনি চারিদিকে তাকায়, কারো মাথায় এলিয়েনের কোনো স্মৃতি নেই, শুধু তার মাথায় আছে। এলিয়েন মেয়েটি তার অনুরোধ রেখেছে। অন্য সবার স্মৃতি মুছে দিলেও তার স্মৃতিটি মুছেনি। তিতুনিকে সে তার স্মৃতিটি উপহার দিয়ে গেছে।

আম্মু একটু অবাক হয়ে তিতুনির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, তারপর বললেন, "আচ্ছা তিতুনি, তুই কি কিছু জানিস এখানে কী হচ্ছে?"

তিতুনি আম্মুর দিকে তাকাল, আম্মু বললেন, "তোকে দেখে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুই কিছু একটা জানিস!"

তিতুনি মাথা নাড়ল, বলল, "না আম্মু। আমি কিছু জানি না।" তারপর চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলল, "খোদা, আমি আম্মুর সাথে মিছে কথা বলেছি। তুমি আমাকে মাফ করে দিও।"

১৫

অন্ধকার রাতে যখন আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা ওঠে তখন তিতুনি তাদের ছাদে একটা মাদুর পেতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আব্বু জিজ্ঞেস করেন, "তুই কী দেখিস তিতুনি?"

তিতুনি বলে, "আকাশের তারা দেখি।"

আম্মু বললেন, "তারার মাঝে আবার দেখার কী আছে?"

তিতুনি বলে, "এই আকাশের বহু দূরে একটার পর একটা গ্যালাক্সি আছে, সেই গ্যালাক্সিতে হয়তো কোথাও কোনো প্রাণী থাকে, তারা হয়তো সেখানে থেকে আমাদের কথা ভাবছে–এটা চিন্তা করতে আমার খুব ভালো লাগে।"

টোটন হি হি করে হেসে বলে, "আমাদের তিতুনি ফিলোসফার হয়ে গেছে আম্মু! দেখেছ?"

তিতুনি কিছু বলে না, সে আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়েই থাকে। না সে ফিলোসফার হয়নি। সে কী হয়েছে সে নিজেও জানে না।